জাভেদ আহমেদ গামিদি

আল-ইসলাম
الاسلام

বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা
ইমদাদ হোসেন

আল-ইসলাম

জাভেদ আহমেদ গামিদি

আল-ইসলাম

الاسلام

বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা

ইমদাদ হোসেন

গামিদি সেন্টার অফ ইসলামিক লার্নিং
আল-মাওরিদ আমেরিকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত (All rights reserved)

প্রকাশক : গামিদি সেন্টার অফ ইসলামিক লার্নিং
আল-মাওরিদ আমেরিকা
মুদ্রণের ধরন : ডিজিটাল সংস্করণ
প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ
ISBN : 979-8-9886271-0-4

Address: 3620 N Josey Ln, Suite 230 Carrollton, TX 75007
Website: www.ghamidi.org

Email: info@ghamidi.org

সূচিপত্র

কিছু কথা ১১

মুখবন্ধ ১৮

ভূমিকা : সত্য ধর্ম ১৯

- ধর্মের উৎস ২০
- কুরআনের পরিচয় ২১
- সুন্নাতের পরিচয় ২১
- ধর্মের হাকিকত ২২
- ধর্মের সংজ্ঞা ২৩
- ধর্মের বিষয়বস্তু ২৩
- নবী ও রাসুল-এর সংজ্ঞা ২৪
- আসমানি কিতাবসমূহের নাজিলের উদ্দেশ্য ২৬
- নবুয়তের সমাপ্তি এবং "ইনজার"-এর দায়িত্ব ২৬
- "ইসলাম" — এই ধর্মের নাম ২৭
- ইমান — ধর্মের রুহানি দিক ২৭
- ইমানের স্থায়ী শর্তসমূহ ২৮
- ইমানের প্রাসঙ্গিক দাবিসমূহ ২৯
- ধর্মের উদ্দেশ্য ৩০
- সঠিক ধর্মীয় মনোভাব ৩১

প্রথম অংশ : আল-হিকমা ৩২

১. ইমানিয়াত ৩৩

আল্লাহর ওপর ইমান ৩৪
যাত ৩৮
সিফাত ৩৮
সুনান ৪২
ফেরেশতাদের ওপর ইমান ৪৭
নবীগণের ওপর ইমান ৪৭
আসমানি কিতাবসমূহের ওপর ইমান ৫৪
প্রতিফল দিবসের ওপর ইমান ৫৫
শাওয়াহিদ (প্রমাণাদি) ৫৬
আলামত ৬০
আহওয়াল (ঘটনাপ্রবাহ) ৬১
মাকামাত (স্থানসমূহ) ৬৩
২. আখলাকিয়াত (নীতি ও নৈতিকতা) ৬৭
মৌলিক নীতিমালা ৬৯
নৈতিকতার গুণাবলি ও মন্দ দিকসমূহ ৭১
আল্লাহর ইবাদত ৭২
পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ৭৩
আল্লাহর পথে ব্যয় (ইনফাক) ৭৫
সতীত্ব ও চারিত্রিক পবিত্রতা ৭৭
মানুষের জীবনের পবিত্রতা ৭৯
এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ ৭৯
অঙ্গীকার রক্ষা করা ৮০
পরিমাপ ও ওজনে সততা ৮০
কুসংস্কার ও ধারণার অনুসরণ ৮১
অহংকার ও দম্ভ ৮২

জামাল ও কামাল (সৌন্দর্য ও পূর্ণতা) ৮৫
ইসলাম ৮৫
ইমান ৮৬
কুনুত ৮৬
সিদক ৮৭
সবর ৮৭
খুশু ৮৮
সদকা ৮৯
রোজা ৯০
হিফজে ফুরুজ ৯০
জিকরে কাসির ৯১
দ্বিতীয় অংশ : আল-কিতাব ৯৩
১. ইবাদতের বিধি-বিধান ৯৪
নামাজ ৯৪
নামাজের ইতিহাস ৯৬
নামাজের শর্তাবলি ৯৬
নামাজের আমল বা কাজ ৯৮
নামাজের জিকির-আজকার ৯৯
নামাজের ওয়াক্ত বা সময় ১০০
নামাজের রাকাত সংখ্যা ১০১
নামাজের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় ১০১
নামাজের জামাত ১০২
জামাত কায়েম করার নিয়ম ১০৩
নামাজে ভুল ১০৪
জুমার নামাজ ১০৪

দুই ঈদের নামাজ ১০৫
জানাজার নামাজ ১০৬
[নফল নামাজ] ১০৭
যাকাত ১০৭
যাকাতের ইতিহাস ১০৮
যাকাতের উদ্দেশ্য ১০৮
যাকাতের বিধান ১০৯
রোজা ১১২
রোজার ইতিহাস ১১৩
রোজার উদ্দেশ্য ১১৪
রোজার নিয়ম-কানুন ১১৪
হজ্জ ও উমরা ১১৫
হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্য ১১৯
হজ্জ ও উমরার দিনসমূহ ১২০
হজ্জ ও উমরার পদ্ধতি ১২০
১. উমরা ১২০
২. হজ্জ ১২৩
কুরবানি ১২৮
কুরবানির ইতিহাস ১২৮
কুরবানির উদ্দেশ্য ১২৯
কুরবানির নিয়ম ১৩০
২. সামাজিক বিধি-বিধান ১৩১
নিকাহ (বিবাহ) ১৩৩
মাহরামগণ ১৩৩
সীমা ও শর্তাবলি ১৩৪

অধিকার ও অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ১৩৫
বহুবিবাহ ১৩৭
সহবাসের সীমারেখা ১৩৮
ইলা ১৩৯
জিহার ১৩৯
তালাক ১৪০
স্বামীর মৃত্যু ১৪৫
নারী ও পুরুষের মেলামেশা ১৪৭
পিতামাতা ১৫০
এতিম ১৫১
৩. রাজনীতির বিধি-বিধান ১৫৫
১. মৌলিক নীতি ১৫৬
২. আসল দায়িত্ব ১৫৬
৩. ধর্মীয় ফরজসমূহ ১৫৬
৪. নাগরিকত্বের অধিকার ১৫৭
৫. শাসনব্যবস্থা ১৫৮
৪. অর্থনীতির বিধি-বিধান ১৫৯
১. মালিকানার পবিত্রতা ১৬০
২. জাতীয় সম্পদ ১৬১
৩. অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ ১৬১
৪. লিখন ও সাক্ষ্য ১৬১
৫. মিরাস (উত্তরাধিকার) বণ্টন ১৬৫
৫. দাওয়াতের বিধি-বিধান ১৬৮
নবীদের দাওয়াত ১৬৮
ইব্রাহিমের বংশধরদের দাওয়াত ১৬৯

আলেমদের দাওয়াত ১৭০
রাষ্ট্রীয় দাওয়াত ১৭১
ব্যক্তির দাওয়াত ১৭২
দাওয়াতের কৌশল ১৭৩
৬. জিহাদের বিধি-বিধান ১৭৫
১. জিহাদের হুকুম ১৭৬
২. জিহাদের উদ্দেশ্য ১৭৭
৩. জিহাদের ফরজ হওয়া ১৭৭
৪. জিহাদে অংশগ্রহণ ১৭৭
৫. জিহাদ থেকে পলায়ন ১৭৮
৬. নৈতিক সীমা ১৭৮
৭. ঐশী সাহায্য (নুসরত-এ-ইলাহি) ১৭৯
৮. যুদ্ধবন্দী ১৭৯
৯. গনিমতের মাল ১৭৯
৭. হুদুদ ও তাজিরাত (দণ্ডবিধি) ১৮০
মুহারাবা (বিদ্রোহ) এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ১৮১
হত্যা ও জখম ১৮৪
জিনা-ব্যভিচার ১৮৫
কাজফ (অপবাদ) ১৮৬
চুরি ১৮৭
৮. খাদ্য ও পানীয় ১৮৮
৯. রসম-রেওয়াজ ও আদব-কায়দা ১৯১
১০. কসম এবং কসমের কাফফারা ১৯৩

কিছু কথা

এই বইটি কাদের জন্য?

যারা আল্লাহতায়ালার ওপর ইমান রাখেন এবং জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক আলোচনা ও দলিল-প্রমাণের ভার ছাড়াই ইসলামকে সহজভাবে জানতে চান — এই বইটি তাদের জন্যই লেখা।

আজ থেকে প্রায় ১৪শ বছর আগে আরবের বুকে মুহাম্মদ (সা.) নামে এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহতায়ালার সর্বশেষ বার্তাবাহক হিসেবে দাবি করেন। তিনি তৎকালীন আরবকে জানিয়ে দেন যে, তিনি খোদার আদালত হিসেবে দুনিয়ায় এসেছেন। তাই যারা তাকে মেনে নেবে, তারা দুনিয়ায় বিজয়ী হবে; আর যারা খোদায়ি বার্তাকে অস্বীকার করবে, তাদেরকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেওয়া হবে। এ ধরনের হুঁশিয়ারি প্রথম দিকে সবাইকে বিস্মিত করে। অধিকাংশ মানুষ একে অসংলগ্ন কথা বলে মনে করে। কারণ, এমন দাবি বিশ্বাস করার মতো কোনো জাগতিক উপায়-উপকরণ তখন ছিল না — যদি না ঐ ব্যক্তি সত্যিই আল্লাহতায়ালার প্রেরিত হন।

অন্যায়, অবিচার, অপবাদ ও নির্যাতন চলতে থাকে। এক পর্যায়ে তিনি নিজ শহর ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন। মূলত এখান থেকেই ঘটনাপ্রবাহ বদলাতে শুরু করে। সত্যিই আল্লাহতায়ালার আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়; খোদাদ্রোহীরা পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়; আর বিজয়ীর

বেশে আল্লাহর রাসুল মক্কায় প্রবেশ করেন। যে কথা ২৩ বছর আগে প্রলাপ বলে উপহাস করা হয়েছিল, তা বাস্তবে পরিণত হয়। শুধু এখানেই শেষ নয় — আরব উপদ্বীপ থেকে শুরু করে সুদূর মরক্কো থেকে উপমহাদেশ পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড করায়ত্ত হয়, ইমানের পুরস্কার হিসেবে খোদাতায়ালার অনুসারীদের জন্য।

এটাই ছিল ইসলামের শেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ (সা.) এবং তার সাথিদের উপাখ্যান। তিনি দুনিয়ায় এক ধরনের "ছোট কিয়ামত" ঘটিয়ে দেন — যা ইতিহাসে অমোচনীয়। তার হাত ধরেই দুনিয়ায় খোদায়ি আদালতের সর্বশেষ বাস্তব চিত্রায়ণ সম্পন্ন হয়। শেষ হয় একটি অধ্যায়; শেষ হয় নবুয়তের ধারাও।

খোদার পক্ষ থেকে দুনিয়ায় তাঁর নির্বাচিত মানুষ পাঠিয়ে হেদায়েতের সিলসিলা যেহেতু শেষ করে দেওয়া হয়েছে, তাই যুক্তির অনিবার্য দাবি হলো — খোদাতায়ালার হেদায়েত আমাদের কাছে এমনভাবে সংরক্ষিত থাকবে, যেন তা চিরকাল অবিকৃত থাকে এবং সকলের নাগালযোগ্য হয়।

খোদাতায়ালা যে হেদায়েতের প্যাকেজ আমাদেরকে দিয়েছেন, তা এমনভাবে সাজানো যে, মানুষের জন্মগত স্বভাব অর্থাৎ মানুষের সহজাত প্রকৃতির সঙ্গে তা সামঞ্জস্যশীল। সহজভাবে বললে, মানুষের সহজাত প্রকৃতি যদি ৫০ হয়, তবে হেদায়েতের এই প্যাকেজ বাকি ৫০; এই দুইয়ে মিলে ১০০ — অর্থাৎ পূর্ণতা। তাই হেদায়েত সংরক্ষণের প্রক্রিয়াও এমনভাবে হয়েছে, যা মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াটি কী?

একবার ভাবুন — মরক্কো থেকে উপমহাদেশ পর্যন্ত কত কোটি মানুষ। তারা সবাই একটি বইকে খোদায়ি বই হিসেবে মানে এবং বিরাট একটি অংশ সেটাকে লাইন-বাই-লাইন মুখস্থ করে। প্রজন্ম

থেকে প্রজন্মে এভাবেই তা লিখে, পড়ে, মুখস্থ করে, সঞ্চারিত হচ্ছে। কোথাও এমন হয়নি যে, এক অঞ্চলের মানুষ বলছে — আমাদের কাছে যে বই আছে সেটাই খোদায়ি; আর বাকিদের কাছে যা আছে তা ভুল। আবার এমন ঘটনাও ঘটেনি যে, কিছু লোক মিলে এ বইয়ে জালিয়াতির ষড়যন্ত্র করল এবং কোটি কোটি মানুষকে বোকা বানিয়ে সে ষড়যন্ত্র সফলও হলো। বাস্তবে এটা সম্ভবও নয়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে কোনো বিষয় যখন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসে, তখন একদল মানুষের পক্ষে যোগসাজশ করে তাতে জালিয়াতি করা এবং পুরো জনগোষ্ঠীর ওপর তা চাপিয়ে দেওয়া অসম্ভব। একেই আরবিতে বলা হয় 'তাওয়াতুর'।

খোদায়ি হেদায়েতের এই প্যাকেজই ইসলাম। এই ইসলাম আমরা তাওয়াতুরের মাধ্যমে মূলত দুইভাবে পেয়েছি।

প্রথমত, গোটা জনগোষ্ঠি একটি গ্রন্থকে খোদায়ি গ্রন্থ হিসেবে মেনে সেটাকে হুবহু মুখস্থ করে, লিখে, পড়ে — প্রজন্মের পর প্রজন্মে তা স্থানান্তর করে। এটাই হলো কুরআন।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বের যেখানেই মুসলমানদের সমাজ রয়েছে, তারা কিছু ব্যবহারিক কাজ ধর্ম হিসেবে পালন করে — যা সর্বত্র এক ও অভিন্ন। আজান হলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজান মাস এলে রোজা, জিলহজ্জ মাস এলে সামর্থ্যবানদের হজ্জ — এ ধরনের বহু ধর্মীয় অনুশীলন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কোনো একটি চক্র এসবের কোনো একটিতে জালিয়াতি করে তা সবার ওপর চাপিয়ে দেবে — এমনটি বাস্তবসম্মত নয়। এটাই 'ব্যবহারিক তাওয়াতুর'। এই ব্যবহারিক তাওয়াতুরের মাধ্যমে আমরা যে ধর্মীয় বিধি-বিধান পেয়েছি, পারিভাষিক ভাষায় তাকে বলা হয় 'সুন্নাত'।

মোট কথা, কুরআন ও সুন্নাত মিলেই ইসলাম। এই দুই বিষয়ে আমরা পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি — এটাই সেই ইসলাম, যা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন জমিনে আল্লাহর আদালত হয়ে আসা শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)।

এটা মুদ্রার এক পিঠ। এবার মুদ্রার অন্য পিঠে আসি।

মরক্কো থেকে উপমহাদেশ, চীন, সুমাত্রা — দূর বহুদূর পর্যন্ত ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। নানা কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে মিশেছে; ইতিহাসের উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে। ইসলামের নামে শত শত দল-উপদল হয়েছে। একদল আরেকদলকে ইসলাম থেকে বের করে দিতে চায়। সবাই নিজেকে "সঠিক ইসলামের দল" বলে। এমন নয় যে, এসব দলের কোথাও আলেম-ওলামা নেই — বরং প্রায় সবখানেই আছেন। এই টালমাটাল বাস্তবতায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে: আমি কীভাবে সেই ইসলামকে খুঁজে নেব, যা নিয়ে এসেছিলেন জমিনে আল্লাহর আদালত হয়ে আসা শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)?

এই প্রশ্নের উত্তর আপনি কীভাবে দেন — কোন পদ্ধতিতে এই প্রশ্নের মুকাবিলা করেন — তার ওপরই নির্ভর করে আপনার উদ্দেশ্য। এবং এটাই আল্লাহর অন্যতম একটি পরীক্ষা।

আগেই বলেছি, খোদায়ি হেদায়েতের এই প্যাকেজ মানুষের সহজাত প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। মানুষের সহজাত প্রকৃতিকে আরবিতে বলা হয় 'ফিতরাত'। ফলে ইসলাম হলো *ফিতরাতের* ধর্ম। খোদাতায়ালা এর সংরক্ষণব্যবস্থাও করেছেন মানুষের *ফিতরাতের* উপযোগী করেই। তাই যখন আপনি তাওয়াতুরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইসলামকে আলাদা করে বুঝতে পারবেন, তখনই আপনি পেয়ে

যাবেন সেই ইসলাম — যা নিয়ে এসেছিলেন জমিনে আল্লাহর আদালত হয়ে আসা শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)।

ঠিক এই কাজটিই করেছেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও যুগের অনন্য মনীষী জাভেদ আহমেদ গামিদি। তিনি প্রায় দুই দশকের নিরলস পরিশ্রমে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজ সম্পন্ন করেন এবং "মিজান" নামে একটি বই লেখেন। উদ্দেশ্য সেই ইসলামকে তুলে ধরা, যা নিয়ে এসেছিলেন জমিনে আল্লাহর আদালত হয়ে আসা শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)। তবে "মিজান" গ্রন্থটি কলেবরে বড় এবং জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক আলোচনা ও দলিল-প্রমাণে সমৃদ্ধ। তাই সাধারণ পাঠকদের জন্য তিনি এমন একটি সংস্করণ তৈরি করেন, যা তাত্ত্বিক আলোচনা ও দলিল-প্রমাণের ভারে ভারী নয় — বরং কেবল মূল বিষয়বস্তুর সরল উপস্থাপনা। আর সেটাই হলো আপনাদের হাতে থাকা এই বই — "আল-ইসলাম"।

বইটি মূলত উর্দু ভাষায় রচিত। বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব সাবলীল ও পাঠযোগ্যভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। অনুবাদে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে; তবে কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য রূপ বজায় রাখতে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে — যেমন: ঈদ, নবী। 'আল্লাহ' এবং আল্লাহ-সংশ্লিষ্ট সর্বনামের ক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয়েছে, অন্য সব ক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয়নি। ভাবার্থের পূর্ণতা ও সাবলীলতার প্রয়োজনে যেসব স্থানে বাড়তি কথা যুক্ত করা হয়েছে, সেখানে তৃতীয় বন্ধনী [ ] ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো লেখকের মূল বক্তব্যের অংশ না হওয়ায় এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন পাঠকের পাঠপ্রক্রিয়ায় কোনো বিভ্রান্তি তৈরি না হয়। অনুবাদে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। আশা করি পাঠকগণ সেগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ায় গামিদি সেন্টার অফ ইসলামিক লার্নিং (Ghamidi Center of Islamic Learning)-কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। মহান আল্লাহ এই কাজটিকে কবুল করুন।

— ইমদাদ হোসেন
লেখক ও অনুবাদক

মুখবন্ধ

আল্লাহতায়ালার নিকট ধর্ম কেবল ইসলাম। আমি এই ধর্মকে যেভাবে বুঝেছি, তা আমি আমার "মিজান" বইয়ে বর্ণনা করেছি। "আল-ইসলাম" বইটি মূলত "মিজান" বইয়ের সারসংক্ষেপ, যেখানে মূল বিষয়বস্তুকে সহজ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও সেগুলোর দলিল-প্রমাণের অংশকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ধর্মের অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছি এবং যা কিছু বর্ণনা করেছি, তা উস্তাদ ইমাম আমিন আহসান ইসলাহির প্রশিক্ষণের ফসল। তাই অন্যান্য সব বইয়ের মতো আমার এই বইটিও তারই নামে নিবেদিত:

তোমার স্বভাব মোদের কাব্যে দিয়েছে পাঠের দিশা,
মনে হয় যেন পূর্ব হতে লভিয়াছি নুরের পরোয়ানা।

— জাভেদ
আল-মাওরিদ, লাহোর
২৫ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রি.

ভূমিকা : সত্য ধর্ম

ধর্মের উৎস

ধর্ম হচ্ছে আল্লাহতায়ালার হেদায়েত, যা তিনি প্রথমে মানুষের *ফিতরাত* তথা সহজাত প্রকৃতিতে *ইলহাম* করেছেন বা গেঁথে দিয়েছেন। এরপর তিনি এই হেদায়েতের যাবতীয় জরুরী বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ স্বীয় নবীগণের মাধ্যমে মানবজাতিকে দিয়েছেন। এই ধারাবাহিকতা তথা সিলসিলার শেষ নবী মুহাম্মদ (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)। সুতরাং, ধর্মের একমাত্র উৎস এখন মুহাম্মদ (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর মহান ব্যক্তিসত্তা এবং সত্য ধর্ম এখন সেটাই, যেটাকে নবীজি নিজের কথা-কাজ এবং মৌনসম্মতি-অনুমোদনের[১] মাধ্যমে ধর্ম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) থেকে এই ধর্ম তার সাহাবীদের *ইজমা*[২] এবং মৌখিক ও ব্যবহারিক *তাওয়াতুরের*[৩] মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং দুটো পথ ধরে আমাদের কাছে পৌঁছেছে:

---

১ এর অর্থ হচ্ছে: ধর্ম হিসেবে কোনো কিছু নবীর সামনে ঘটেছে এবং তিনি তা থেকে নিষেধ করেননি।

২ অর্থাৎ কোনো বিরোধ ছাড়াই, পূর্ণ ঐকমত্যের সঙ্গে।

৩ অর্থাৎ কোনো বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যে জিনিসের পঠন, লিখন, বিবরণ প্রদান চলমান এবং সেটার ওপর আমল করা চলমান।

১। কুরআন মাজিদ

২। সুন্নাত

কুরআনের পরিচয়

কুরআন মাজিদ সেই কিতাব, যা আল্লাহতায়ালা তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদ (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর ওপর নাজিল করেছেন এবং কুরআনের নাজিল হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এটা মুসলমানদের নিকট এই স্পষ্টতার সঙ্গে বিদ্যমান যে, এটাই সে কিতাব, যা মুহাম্মদ (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর ওপর নাজিল হয়েছিল এবং যেটাকে নবীর সাহাবিগণ তাদের *ইজমা* ও মৌখিক *তাওয়াতুরের* মাধ্যমে পূর্ণ সুরক্ষার সাথে সামান্যতম পরিবর্তন ছাড়াই দুনিয়ার কাছে স্থানান্তর করেছেন।

সুন্নাতের পরিচয়

সুন্নাত ইব্রাহিমি ধর্মের ঐ সকল ঐতিহ্য, যেগুলোকে নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) পুনরুজ্জীবিত করেছেন, সংস্কার[৪] করেছেন; অতপর সেগুলোতে প্রয়োজনীয় সংযোজন আনার পর তার অনুসারীদের জন্য ধর্ম হিসেবে জারি করেছেন।

প্রামাণিকতার দিক থেকে সুন্নাত ও কুরআন মাজিদে কোনো পার্থক্য নেই। কুরআন যেভাবে সাহাবিদের *ইজমা* ও মৌখিক *তাওয়াতুরের* মাধ্যমে পাওয়া গেছে, সুন্নাতও ঠিক সেভাবে সাহাবিদের *ইজমা* ও ব্যবহারিক *তাওয়াতুরের* মাধ্যমে পাওয়া গেছে এবং

[৪] অর্থাৎ যা ভুলে যাওয়া হয়েছে, সেগুলোকে নতুন করে তাজা করা এবং যেগুলোতে ভুল রয়েছে, সেগুলোকে শুদ্ধ করার পর।

কুরআনের মতোই প্রতিটি যুগে মুসলমানদের *ইজমা* দ্বারা সুন্নাত প্রমাণিত।

ধর্মের হাকিকত

এই ধর্মের হাকিকত যদি এক শব্দে বর্ণনা করা হয়, তবে কুরআনের পরিভাষায় তা হচ্ছে: আল্লাহর "ইবাদত"। এর অর্থ বিনয় ও নম্রতা। ইবাদত যদি আল্লাহতায়ালার সঠিক *মারেফত* তথা পরিচয়ের সাথে জন্ম নেয়, তবে তা পরম ভালোবাসা ও পরম ভয়ের সাথে আল্লাহর সামনে শেষ সীমা পর্যন্ত নিজেকে অবনত করার রূপ ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এটা মানুষের অন্তরের এক গভীর অনুভূতি। আল্লাহর জিকির, তাঁর শোকর, তাঁর অসন্তুষ্টির ভয়, তাঁর সাথে *ইখলাস* বজায় রাখা তথা একনিষ্ঠ হওয়া, তাঁর ওপর ভরসা করা এবং তাঁর দরবারে নিজেকে সমর্পন করা ও তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা — এগুলো এই অবস্থার অভ্যন্তরীণ প্রকাশ। মানুষের বাহ্যিক অস্তিত্বে এই জিনিসগুলো ইবাদতের প্রকাশ — অর্থাৎ রুকু ও সেজদা, *তাসবিহ ও তাহমিদ* (আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা), দোয়া ও মোনাজাত এবং *নজর* ও *নিয়াজ* (মানত ও উৎসর্গের) সুরতে প্রকাশ পায়। মানুষ যেহেতু এই দুনিয়ায় নিজের একটি কর্মময় সত্তা রাখে, তাই এই বহিঃপ্রকাশ সামনে অগ্রসর হয়ে মানুষের সেই কর্মময় সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং ইবাদতের সাথে আনুগত্যও তখন ঐ সত্তায় শামিল হয়। এটা তখন মানুষের কাছে দাবি জানায় যে, *জাহের ও বাতেন* তথা প্রকাশ্য ও গোপন — উভয় অবস্থাতেই সে যেন আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকে।

ধর্মের সংজ্ঞা

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে *আবদ ও মাবুদ* তথা বান্দা ও প্রভুর এই সম্পর্কের জন্য এই ইবাদত যখন নিজের ভিত্তিমূল নির্ধারণ করে, রীতিনীতি স্থির করে এবং দুনিয়ায় এই সম্পর্কের দাবিসমূহ পূরণের জন্য সীমা ও বিধি-নিষেধ নির্ধারণ করে, তখন কুরআনের ভাষায় একে *দ্বীন* বা ধর্ম বলা হয়। ধর্মের যে রূপ আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীদের মাধ্যমে মানুষের নিকট স্পষ্ট করেছেন, কুরআন সেটাকে "দ্বীনুল হক" বা সত্য ধর্ম বলে এবং এই সত্য ধর্মের ব্যাপারে কুরআন তাদেরকে হেদায়েত করে যে, তারা যেন এই সত্য ধর্মকে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতার সাথে মেনে চলে, নিজেদের জীবনে পূর্ণভাবে বহাল রাখে এবং এতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি না করে।

ধর্মের বিষয়বস্তু

এই ইবাদতের জন্য ইমান ও আখলাকের যে ভিত্তিগুলো খোদাতায়ালার এই ধর্মে বর্ণিত হয়েছে, কুরআন সেগুলোকে 'আল-হিকমা' এবং এর রীতিনীতি ও সীমারেখাকে 'আল-কিতাব' বলে। 'আল-কিতাব'-এর জন্য আরেকটি শব্দ "শরিয়ত"-ও রয়েছে। এর অর্থ সেটাই, যা আমরা 'কানুন' শব্দ দিয়ে প্রকাশ করি।

'আল-হিকমা' সর্বদা এক ও অভিন্ন, কিন্তু মানব সভ্যতার বিবর্তন ও পরিবর্তনের কারণে শরিয়তে অবশ্য অনেককিছু ভিন্নতর হয়েছে।

পূর্ববর্তী আসমানি সাহিত্য অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, *তাওরাতে* বেশিরভাগ শরিয়ত এবং *ইনজিলে* হিকমা বর্ণিত হয়েছে। *যাবুর* এই হিকমার মুখবন্ধ হিসেবে আল্লাহতায়ালার মহিমা কীর্তনের গীত এবং *কুরআন* এই উভয়ের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম, সতর্কবাণী ও সুসংবাদ সংবলিত কিতাব হিসেবে নাজিল হয়েছে।

'আল-হিকমা' পরিভাষাটি যেসব বিষয়ের আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, তা মূলত দুইটি:

এক: *ইমানিয়াত*।

দুই: *আখলাকিয়াত* (নীতি ও নৈতিকতা)।

'আল-কিতাব'-এর অধীনে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, সেগুলো হলো:

১। ইবাদতের বিধি-বিধান,

২। সামাজিক বিধি-বিধান,

৩। রাজনীতির বিধি-বিধান,

৪। অর্থনীতির বিধি-বিধান,

৫। দাওয়াতের বিধি-বিধান,

৬। জিহাদের বিধি-বিধান,

৭। হুদুদ ও তাজিরাত (দণ্ডবিধি),

৮। খাদ্য ও পানীয়,

৯। রসম-রেওয়াজ ও আদব-কায়দা,

১০। কসম এবং কসমের কাফফারা।

এগুলোই গোটা ধর্মের বিষয়বস্তু।

নবী ও রাসুল-এর সংজ্ঞা

আল্লাহতায়ালার যে বার্তাবাহকগণ এই ধর্ম নিয়ে এসেছেন, তাদেরকে নবী বলা হয়। কুরআন থেকে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে

কেউ কেউ "নবুয়ত"-এর সাথে "রিসালাত"-এর মসনদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

"নবুয়ত" হচ্ছে: মানুষের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি ওহি পেয়ে লোকদেরকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করে এবং তার অনুসারীদেরকে কিয়ামতের দিনে উত্তম পরিণামের সুসংবাদ দেয় এবং তার অমান্যকারীদেরকে মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেন। কুরআন এই বিষয়টাকে "ইনজার" ও "বাশারাত" দ্বারা ব্যক্ত করে।

"রিসালাত" হচ্ছে: নবুয়তের মসনদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি নিজের জাতির জন্য এমনভাবে খোদাতায়ালার আদালত হয়ে আসেন যে, তার জাতি যদি তাকে অস্বীকার করে, তবে খোদার ফয়সালা এই দুনিয়াতেই তাদের ওপর কার্যকর করেন এবং এভাবেই তিনি কার্যত ঐ জাতির ওপর সত্যের বিজয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

রিসালাতের বহিঃপ্রকাশ যেভাবে ঘটে, সেটার প্রকৃতি এমন যে, আল্লাহতায়ালা এই রাসুলদেরকে নিজের পুরস্কার ও শাস্তির প্রকাশস্থল হিসেবে মনোনীত করেন এবং তাদের মাধ্যমে কিয়ামতের আগেই একটি 'ছোট কিয়ামত' এই দুনিয়াতেই ঘটিয়ে দেখান। রাসুলদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা যদি খোদার সাথে নিজেদের অঙ্গীকারে অটল থাকেন, তবে তার পুরস্কার এবং অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হলে তার শাস্তি তারা দুনিয়াতেই পাবেন। এর ফল এটা দাঁড়ায় যে, রাসুলদের অস্তিত্ব মানুষের জন্য খোদার নিদর্শনে পরিণত হয় এবং মানুষ যেন রাসুলের সঙ্গে খোদাকেই জমিনে চলাফেরা করতে এবং বিচার-আচার করতে দেখতে পায়। এর পাশাপাশি রাসুলদেরকে আদেশ দেওয়া হয়, যে সত্যকে তারা চর্মচক্ষে দেখেছেন, সেটার প্রচার করেন এবং আল্লাহতায়ালার হেদায়েত কোনো কমবেশি ছাড়াই এবং পূর্ণ অকাট্যতার সাথে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। কুরআনের পরিভাষা

অনুযায়ী এটা "শাহাদাত"। শাহাদাত যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দুনিয়া ও আখিরাত — উভয় ক্ষেত্রেই এটা খোদায়ি ফয়সালার ভিত্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং আল্লাহতায়ালা এই রাসুলদেরকে বিজয় দান করেন এবং তাদের দাওয়াতের অস্বীকারকারীদের ওপর নিজের আজাব নাজিল করেন।

শাহাদাত-এর এই মসনদ রাসুলদের ছাড়াও সাইয়্যিদুনা ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*)-এর বংশধরদেরও প্রদান করা হয়েছে। কুরআন এটাকে সামনে রেখে তাদেরকে খোদার রাসুল ও তাঁর বান্দাদের মাঝে একটি জামাত হিসেবে গণ্য করেছে এবং জানিয়েছে যে, এই পদের জন্য তারা ঠিক সেভাবেই মনোনীত হয়েছে, যেভাবে মানুষদের মধ্য থেকে আল্লাহতায়ালা কিছু ব্যক্তিকে নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য মনোনীত করেন।

আসমানি কিতাবসমূহের নাজিলের উদ্দেশ্য

নবী ও রাসুলদের সাথে আল্লাহতায়ালা সাধারণভাবে নিজের কিতাবসমূহও নাজিল করেছেন। এই কিতাবগুলোর নাজিলের উদ্দেশ্য কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সত্য ও মিথ্যার জন্য এগুলো 'মিজান' (মানদণ্ড) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে — যাতে এগুলোর মাধ্যমে মানুষ তাদের মতপার্থক্য নিরসন করতে পারে এবং এভাবে সত্যের ব্যাপারে ঠিক ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

নবুয়তের সমাপ্তি এবং "ইনজার"-এর দায়িত্ব

নবুয়ত ও রিসালাতের এই সিলসিলা আদম *আলাইহিস সালাম* থেকে শুরু হয়ে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এ শেষ হয়েছে। নবীজির দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর ওহি ও

ইলহাম তথা খোদায়ি অনুপ্রেরণার দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে এবং নবুয়ত চিরতরে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। অতএব, মানুষকে ধর্মের ওপর কায়েম রাখার জন্য "ইনজার" তথা সতর্ক করার দায়িত্ব এখন কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের আলেমগণ পালন করবেন।

"ইসলাম" — এই ধর্মের নাম

এই ধর্মের নাম "ইসলাম"। এই ধর্ম সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা তাঁর কিতাবে বলেছেন যে, মানুষের কাছ থেকে তিনি এর বাইরে কখনোই অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করবেন না।

"ইসলাম" শব্দটি যেভাবে পুরো ধর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়, তেমনি ধর্মের বাহ্যিক রূপকেও কোনো কোনো সময় এই ইসলাম শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। নিজের এই বাহ্যিক রূপ অনুযায়ী ইসলাম এই পাঁচটি জিনিসের সমষ্টি:

১। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম* তাঁর রাসুল,

২। নামাজ কায়েম করা,

৩। যাকাত আদায় করা,

৪। রমজানের রোজা রাখা,

৫। *বাইতুল্লাহ* তথা কাবাঘরের হজ্জ করা।

ইমান — ধর্মের রুহানি দিক

ধর্মের *বাতিন* তথা রুহ হচ্ছে: ইমান। কুরআনে এর যে বিবরণ বর্ণিত হয়েছে, সে অনুযায়ী এটাও পাঁচটি জিনিসের সমষ্টি:

১। আল্লাহর ওপর ইমান,

২। ফেরেশতাদের ওপর ইমান,

৩। নবীদের ওপর ইমান,

৪। কিতাবসমূহের ওপর ইমান,

৫। প্রতিফল দিবসের ওপর ইমান।

ইমানের স্থায়ী শর্তসমূহ

এই ইমান যখন নিজের হাকিকত বা প্রকৃত রূপ অনুযায়ী অন্তরে গেঁথে যায় এবং অন্তর থেকে নিজের সত্যায়ন লাভ করে, তখন তা আপন অস্তিত্বের তাগিদে দুটি জিনিসের দাবি করে:

এক, *আমলে সালেহ* (সৎকর্ম),

দুই, 'তাওয়াসি বিল হক' (সত্যের উপদেশ) এবং 'তাওয়াসি বিস সবর' (ধৈর্যের উপদেশ)।

আমলে সালেহ বলতে সেসব কাজকে বোঝায়, যা চরিত্র সংশোধনের ফলে সৃষ্টি হয়। এর সমস্ত ভিত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও মানুষের সহজাত প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং খোদার শরিয়ত এই আমলের দিকেই মানুষকে পথ দেখানোর জন্য নাজিল হয়েছে।

'তাওয়াসি বিল হক' এবং 'তাওয়াসি বিস সবর'-এর অর্থ হলো: নিজের পরিবেশে একে অপরকে সত্যের এবং সত্যের ওপর অবিচল থাকার উপদেশ দেওয়া। কুরআন একে "আমর বিল মারুফ" এবং "নাহি আনিল মুনকার" হিসেবেও অভিহিত করেছে। অর্থাৎ যেসব বিষয় বুদ্ধিবৃত্তি ও মানুষের সহজাত প্রকৃতির দৃষ্টিতে 'মারুফ' (ভাল),

নিজের নিকট পরিমণ্ডলে মানুষকে সেগুলোর প্রতি উপদেশ দেওয়া এবং যা 'মুনকার' (মন্দ), সেগুলো থেকে মানুষকে বিরত রাখা।

ইমানের প্রাসঙ্গিক দাবিসমূহ

সাধারণ পরিস্থিতিতে ইমানের দাবি এগুলোই, তবে মানুষ যে পৃথিবীতে বাস করে, সে মোতাবেক তার সামনে যেসব অবস্থা দেখা দিতে পারে, সেগুলোর প্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলো ছাড়াও আরও তিনটি দাবি ইমান থেকে সৃষ্টি হয়:

এক. হিজরত,

দুই. *নুসরাত* (সাহায্য),

তিন. *কিয়াম বিল কিসত* (ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা)।

কোনো মুমিন বান্দার জন্য যদি কোনো স্থানে নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে অবিচল থাকা প্রাণান্তকর হয়ে উঠে, ধর্মের কারণে তাকে অতিষ্ঠ করা হয়, এমনকি নিজের ইসলাম প্রকাশ করাটা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে তার এই ইমান তার কাছে দাবি জানায় যে, সে ওই স্থান ত্যাগ করে এমন কোনো স্থানে চলে যাবে, যেখানে সে প্রকাশ্যে নিজের ধর্ম পালন করতে পারে। কুরআন একে "হিজরত" বলে এবং নবীর পক্ষ থেকে হিজরতের দাওয়াতের পর নিজেকে এমন পরিস্থিতিতে দেখেও যারা এটাকে উপেক্ষা করে, তাদের জন্য কুরআন জাহান্নামের হুঁশিয়ারি শুনিয়েছে।

একইভাবে, ধর্মের প্রচার বা ধর্মের হেফাজতের জন্য যদি কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে ইমানের দাবি হলো: জান ও মাল দিয়ে ধর্মকে সাহায্য করা। কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী এটা খোদার "নুসরাত" (সাহায্য) এবং এটার দাবি হচ্ছে: কোনো সময় যদি

ইমানের এই দাবি সামনে চলে আসে, তবে মুমিন বান্দার কাছে দুনিয়ার কোনো কিছুই এর চেয়ে বেশি প্রিয় হবে না।

অতঃপর, এই দুনিয়ায় মানুষের আবেগ, পক্ষপাত, স্বার্থ এবং কামনা-বাসনা যদি ধর্ম বা দুনিয়ার কোনো বিষয়ে তাকে ইনসাফের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়, তবে এই ইমানই দাবি করে যে, মুমিন বান্দা কেবল সত্য ও ইনসাফের ওপর অবিচল থাকবে তাই নয়, বরং এগুলো যদি সাক্ষ্যের দাবি করে, তবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও এসবের দাবি পূরণ করবে। সে সত্য বলবে, সত্যের সামনে নিজের মাথা নত করবে। ইনসাফ করবে, ইনসাফের সাক্ষ্য দেবে এবং নিজের আকিদা ও আমলে ইনসাফ ছাড়া কখনো কিছু গ্রহণ করবে না। কুরআন এটার জন্য 'কিয়াম বিল কিসত' (ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা) পরিভাষা ব্যবহার করেছে।

ধর্মের উদ্দেশ্য

এই ধর্মের যে উদ্দেশ্য কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তা কুরআনের পরিভাষায় *তাজকিয়া*। এর অর্থ হচ্ছে: মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনকে পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে তার চিন্তা ও কর্মকে সঠিক পথে বিকশিত করা। কুরআন মাজিদে এই কথা বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের লক্ষ্য হচ্ছে: সুউচ্চ জান্নাতের বাদশাহি এবং সফলতার এই স্থানে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা কেবল তাদেরই জন্য, যারা এই দুনিয়ায় নিজেদের *তাজকিয়া* করে। সুতরাং *তাজকিয়া*-ই হচ্ছে ধর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল্লাহর নবীগণ এই উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছেন এবং সমগ্র ধর্ম এই উদ্দেশ্য অর্জন ও এই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য মানুষকে পথপ্রদর্শনের জন্যই নাজিল হয়েছে।

সঠিক ধর্মীয় মনোভাব

এই ধর্ম মোতাবেক আমল করার জন্য এর অনুসারীদের যে কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত, তা হচ্ছে: "ইহসান"। ইহসান-এর অর্থ: কোনো কাজকে তার সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সম্পাদন করা। এর রূপ এই যে, মানুষ আল্লাহতায়ালার ইবাদত এমনভাবে করবে যেন সে তাঁকে দেখছে; কারণ যদি সে তাঁকে দেখতে না-ও পায়, তবে তার প্রতিপালক তো তাকে দেখছেন।

প্রথম অংশ : আল-হিকমা

[এক: *ইমানিয়াত,* দুই: *আখলাকিয়াত* (নীতি ও নৈতিকতা)]

১. ইমানিয়াত

ইমান একটি ধর্মীয় পরিভাষা। কোনো বিষয়কে অন্তরের পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে মেনে নেওয়াকে ইমান বলে। এর মূল হলো আল্লাহর ওপর বিশ্বাস। মানুষ যদি তার প্রতিপালককে এমনভাবে বিশ্বাস করে যে, পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টির শেষ স্তরে পৌঁছে নিজের হৃদয় ও মস্তিষ্ককে তাঁর নিকট সোপর্দ করে, তবে কুরআনের পরিভাষায় সে মুমিন। ইমানের হাকিকত এটাই, যার ভিত্তিতে কুরআন দাবি করে যে, মানুষের কথা ও কাজকেও এর সাক্ষী হতে হবে। তাই কুরআন প্রতিটি নেক কাজ বা পুণ্যকে ইমানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং মুমিনদের অপরিহার্য গুণ হিসেবে বর্ণনা করে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আইনের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তিই মুমিন, যে মুখে ইসলামের স্বীকৃতি দেয়। (আইনি ক্ষেত্রে) তার এই ইমানকে কম বা বেশি বলে গণ্য করা যায় না। কিন্তু যেখানে প্রকৃত ইমানের সম্পর্ক, তা কখনোই কোনো স্থবির বা জড় বস্তু নয়। আল্লাহর জিকির, তাঁর আয়াতসমূহের তিলাওয়াত এবং মানুষের নিজ সত্তা ও বিশ্বজগতের নিদর্শনে আল্লাহর মহিমার বহিঃপ্রকাশ দেখার মাধ্যমে ইমান বৃদ্ধি পায়। কুরআন মাজিদ ইমানকে এমন একটি গাছের সাথে তুলনা করেছে, যার মূল মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আসমানের বিশালতায় ছড়িয়ে আছে।

একইভাবে ইমান হ্রাস পাওয়ার বিষয়টিও সত্য। মানুষ যদি উপকারী জ্ঞান এবং সৎকাজের মাধ্যমে অনবরত নিজের ইমানকে বাড়ানোর পরিবর্তে এর চাহিদার বিপরীত কাজ করে, তবে ইমান কমতে থাকে; এমনকি কোনো কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে তা সম্পূর্ণ নিঃশেষ পর্যন্ত হয়ে যায়।

এর থেকে স্পষ্ট যে, ইমান এবং আমল একে অপরের পরিপূরক বা অবিচ্ছেদ্য। অতএব, ইমানের সাথে আমল যেমন জরুরি, তেমনি আমলের সাথে ইমানও জরুরি। পরকালীন মুক্তির জন্য কুরআন মাজিদ প্রতিটি স্থানে ইমানকেই প্রথম ও প্রধান শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

এই ইমান মূলত পাঁচটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত:

১. আল্লাহর ওপর ইমান,

২. ফেরেশতাদের ওপর ইমান,

৩. নবীগণের ওপর ইমান,

৪. আসমানি কিতাবসমূহের ওপর ইমান,

৫. প্রতিফল দিবসের ওপর ইমান।

আল্লাহর ওপর ইমান

আল্লাহ এমন এক সত্তার নাম, যিনি আসমান-জমিন এবং সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা। এই নাম শুরু থেকেই বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর আগে জাহেলি আরবেও এটা এই অর্থেই ব্যবহৃত হতো। ইব্রাহিমি ধর্মের যে অবশিষ্টাংশ আরবরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল, এই শব্দটিও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

এই সত্তার স্বীকৃতি এমন একটি বিষয়, যা অনাদিকাল থেকেই মানুষের *ফিতরাত* তথা সহজাত প্রকৃতিতে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। কুরআনের বর্ণনা হলো, এই বিষয়টি একটি অঙ্গীকার ও চুক্তির আকারে হয়েছে। এই অঙ্গীকারের কথা কুরআন একটি বাস্তব ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে। মানুষকে এখানে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে, এই কারণে এই ঘটনা তো তার স্মৃতি থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এর হাকিকত তার অন্তরের পাতায় খোদিত এবং তার মস্তিষ্কের গহীনে প্রোথিত রয়েছে; কোনো কিছুই একে মুছে ফেলতে পারে না। ফলে পরিবেশে কোনো বাধা না হলে এবং মানুষকে এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে, সে এর দিকে সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেভাবে শিশু মায়ের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে; যদিও সে নিজেকে কখনো মায়ের পেট থেকে বের হতে দেখেনি এবং এই বিশ্বাস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেন সে আগে থেকেই এটাকে জানে। সে অনুভব করে যে, খোদার এই স্বীকৃতি তার একটি *ফিতরি* বা সহজাত প্রয়োজনের দাবির জবাব, যা তার ভিতরেই বিদ্যমান ছিল। সে যখন এটাকে পেয়ে যায়, তখন তার মনোজগতের সকল চাহিদাও এর সাথেই নিজস্ব স্থান পেয়ে যায়। কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, মানব সত্তার এই সাক্ষ্য এতটাই অকাট্য যে, খোদার রবুবিয়াত তথা প্রতিপালনের ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

মানুষের অন্তরের এই পথ-নির্দেশনার সাথে তাকে এই যোগ্যতাও দেওয়া হয়েছে যে, নিজের বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দিয়ে সে যা কিছু দেখে, শোনে ও অনুভব করে, তা থেকে এমন কিছু বাস্তবতা আহরণ করে, যা ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত। এর একটি সহজ উদাহরণ হলো মহাকর্ষ সূত্র (Law of Gravitation)। আপেল গাছ থেকে ছিঁড়লে মাটিতে পড়ে। মাটি থেকে পাথর তুলতে হলে এর জন্য শক্তি ব্যয় করতে হয়। সিঁড়ি দিয়ে নামার চেয়ে উপরে উঠা কঠিন। চাঁদ এবং নক্ষত্র মহাকাশে আবর্তন

করে। মানুষ এসব জিনিস শতাব্দী ধরে দেখছিল। হঠাৎ একদিন নিউটন উদ্ঘাটন করলেন যে, এসবই মহাকর্ষ বলের কারিশমা। এই নিয়ম স্বয়ং পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়, কিন্তু বর্তমানে পুরো পৃথিবী একে একটি বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে স্বীকার করে। এর কারণ, এই তত্ত্ব সকল জানা সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে সমস্ত পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা হয়ে যায় এবং অন্য কোনো তত্ত্ব এখন পর্যন্ত সামনে আসেনি, যা বাস্তব ঘটনাবলির সাথে এই মাত্রায় সামঞ্জস্য রাখে।

এটা স্পষ্ট যে, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য — তা থেকে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়েরও অনুমান করা যায়। মানুষ যখন নিজের এই যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে এবং নিজের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করে, তখন তার এই গবেষণা তার অন্তরের গভীরে লুকিয়ে থাকা এই হাকিকতেরই সাক্ষ্য দেয়।

ফলে সে দেখতে পায়, এই দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু সৃষ্টিশীল সৌন্দর্যের এক অলৌকিক বহিঃপ্রকাশ; প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আছে সীমাহীন অর্থময়তা, অসাধারণ আয়োজন; আছে প্রজ্ঞা, পরিকল্পনা, উপকারিতা এবং বিস্ময়কর শৃঙ্খলা ও বিন্যাস; আছে অতুলনীয় জ্যামিতি ও গণিত — যার ব্যাখ্যা এটা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, এই মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছে এবং এই স্রষ্টা কোনো অন্ধ ও বধির শক্তি নন; বরং তিনি এক অসীম বুদ্ধিমত্তা। এর কারণ হলো: কোনো জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান সত্তা থেকে যদি শক্তির প্রকাশ না হয়, তবে তা নিছক জবরদস্তি হওয়াই উচিত; কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়। বরং এর মধ্যে আছে সর্বোচ্চ মাত্রার সামঞ্জস্য, অপরিসীম সঙ্গতি; যা থেকে অসাধারণ সব উপকার ও আশ্চর্য-অদ্ভুত রূপান্তর — যা কোনো অন্ধ ও বধির শক্তি থেকে কখনোই সৃষ্টি হতে পারে না।

এই সাক্ষ্যগুলো যদিও যথেষ্ট ছিল, তবুও মানুষের ওপর *ইতমামে হুজ্জাত* বা সত্য চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহতায়ালা আরও যে বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন, তা হলো — মানবজাতির সূচনা তিনি এমন একজন মানুষ দিয়ে করেছেন, যে আল্লাহর কথা শুনেছে, তাঁর ফেরেশতাদের দেখেছে এবং এভাবে হাকিকতের সরাসরি পর্যবেক্ষণের সাক্ষ্য দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, যাতে তার এই জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তার বংশধরদের কাছে স্থানান্তরিত হতে থাকে এবং খোদার ধারণা মানবজীবনের কোনো যুগে, জমিনের কোনো প্রান্তে, কোনো জনপদে, কোনো বংশে এবং কোনো প্রজন্মে কখনো অপরিচিত হয়ে না পড়ে।

শুধু এতটুকুই নয়, প্রথম মানুষ হিসেবে আদম ও হাওয়াকে দুনিয়ায় পাঠানোর পর দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত এই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল যে, বনি আদম বা আদম সন্তানেরা যদি নিজেদের ইমান ও আমল গ্রহণযোগ্য হয়েছে কি না — তা এই দুনিয়াতেই জানতে চায়, তবে সে তা জানতে পারত। এটা ছিল সেই যুগের প্রতিটি মানুষের জন্য সত্যকে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া — যাতে তারা নিজেদের মা-বাবার সঙ্গে এই সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এটার পদ্ধতি এমন ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহতায়ালার দরবারে কুরবানি পেশ করত, তারপর আকাশ থেকে আগুন নেমে আসত এবং কবুল হওয়ার নিদর্শন হিসেবে তা গ্রাস করত।

এ থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহর অস্তিত্ব একটি স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা — যার ধারণা মানুষ তার পূর্বপুরুষদের থেকে নিয়ে এসেছে এবং যার সাক্ষ্য আত্মা ও বস্তু — উভয়ই তাদের অস্তিত্ব দিয়ে প্রদান করে। কিন্তু আল্লাহর *যাত* তথা সত্তা কী? তাঁর গুণাবলি কী? তাঁর সেই 'সুনান' কী — যেগুলো তিনি নিজের সত্তার জন্য স্থির করে রেখেছেন? মানুষ যদি নিজের প্রতিপালকের *মারেফত* অর্জন করতে চায়, তবে এসব প্রশ্ন তার

মনে অবশ্যই আসবে। ইমানের জন্য এই *মারেফত* জরুরি। কুরআন যখন আল্লাহতায়ালার প্রতি ইমানের দাবি করেছে, তখন এসব প্রশ্নের উত্তরও সে দিয়েছে। সেই উত্তর কী? আমরা এখানে সেগুলোই ব্যাখ্যা করব।

যাত

আল্লাহতায়ালার *যাত* বা সত্তা সম্পর্কে কুরআন পূর্ণ স্পষ্টতার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে যে, তিনি কোনোভাবেই মানুষের উপলব্ধির সীমার মধ্যে আসতে পারেন না। কারণ, উপলব্ধির মাধ্যমসমূহ যে সত্তা সৃষ্টি করেছেন, তিনি তো নিশ্চিতভাবেই সেগুলোকে পেতে পারেন এবং সেগুলোকে পরিবেষ্টনও করতে পারেন, কিন্তু এই মাধ্যমগুলো কোনোভাবেই তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, যিনি নিজেই সেগুলোকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

সিফাত

আল্লাহতায়ালার *সিফাত* বা গুণাবলি অবশ্য কোনো না কোনো পর্যায়ে মানুষের নাগালে আসে। এর কারণ, গুণাবলি সম্পর্কিত কিছু বিষয়, তা যতই তুচ্ছ হোক না কেন, মানুষের কাছেও আছে। আল্লাহতায়ালা তাঁর জ্ঞান ও সংবাদ, *কুদরত*, *রবুবিয়াত* (প্রতিপালন) এবং *রহমত* ও *হিকমতের* কিছু অংশ আমাদেরও দান করেছেন। সেগুলোর ওপর অনুমান করে খোদার এই গুণাবলি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আমরা গড়ে তুলতে পারি। ফলে কুরআন যখন বলে, তিনি *খালিক* (স্রষ্টা), *কাদির* (সর্বশক্তিমান), *রহমান* ও *রহিম*, *আলিম* ও *হাকিম* (সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান), *হাইয়্যু* ও *কাইয়্যুম* (চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী ধারক), *আউয়াল* ও *আখির* (প্রথম ও শেষ) এবং *জাহির* ও *বাতিন*

(প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য) — তখন এগুলোর মাধ্যমে খোদার গুণাবলি সম্পর্কে একটি ধারণা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই গুণাবলি বোঝার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত, সেগুলোর মধ্যে একটি হলো: এগুলোর সৌন্দর্যের দিক। কারণ *কুদরত* তখনই প্রশংসার যোগ্য হয়, যখন তা *রহমত*, *করম* (অনুগ্রহ) ও ন্যায়বিচারের সাথে থাকে। রাগ, প্রতিশোধ এবং কঠোরতা ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশও যদি জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে হয়, তবে তা প্রশংসনীয়। *রহমত*, *মাগফিরাত* (ক্ষমা) এবং দানশীলতাও নিজ নিজ স্থানে প্রশংসার উপযুক্ত। কুরআন মাজিদে 'গনি'-এর সাথে 'হামিদ', 'আলিম'-এর সাথে 'হাকিম' এবং 'আজিজ'-এর সাথে 'গফুর' গুণাবলি এই সৌন্দর্যের দিকের প্রতি নির্দেশ করতেই এসেছে।

একইভাবে এই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আল্লাহতায়ালার যে ধারণাই প্রতিষ্ঠা করা হোক না কেন, তা *জালাল* (প্রতাপ), *জামাল* (সৌন্দর্য) ও *কামাল* (পূর্ণতা) থেকে মুক্ত হতে পারে না। ফলে একাকী, অদ্বিতীয়, অটল আশ্রয়স্থল — উদাহরণস্বরূপ এগুলো হলো *কামালের* গুণাবলি। পবিত্র, শান্তিময়, নিরাপত্তা দানকারী হলো *জামালের* গুণাবলি এবং বাদশাহ, *গালিব* (পরাক্রমশালী), প্রবল প্রতাপশালী হলো *জালালের* গুণাবলি। মানুষের মনে *জালালের* গুণাবলি থেকে ভয়, ভক্তি ও প্রশংসার আবেগ সৃষ্টি হয় এবং *জামালের* গুণাবলি থেকে সৃষ্টি হয় *হামদ*, আশা ও মহব্বতের। আবার *জালালের* গুণাবলি ইন্দ্রিয়ের কাছে বেশি প্রকাশ্য এবং *জামালের* গুণাবলি *আকল* (বুদ্ধি-বিবেক) ও হৃদয়ের বেশি নিকটবর্তী হয়। প্রতিপালককে সামনে রাখা হলে *জামালের* গুণাবলির প্রাধান্য অনুভূত হয় এবং মানুষের নফস যখন চোখের সামনে থাকে, তখন *জালালের* দিকটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মানুষ খোদার ভয়ে খোদার দিকে ধাবিত হয় এবং তাঁর *জামালের* গুণাবলির আঁচলে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করে। কুরআন মাজিদ যখন বলে, সমস্ত সুন্দর নাম

তাঁরই, তখন এর অর্থ তাঁর নিকট এটাই হয় যে, খোদার *জালাল* ও *জামাল* এবং তাঁর *কামালকে* বর্ণনা করে এমন প্রতিটি নাম-ই সুন্দর এবং সে নামেই খোদাকে ডাকা যেতে পারে।

আল্লাহতায়ালার *কামালের* গুণাবলি এই দিক থেকে গুরুত্ববহ যে, সেগুলো থেকে তাঁর মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে। মানুষ যখন এসব গুণের সঠিক ধারণা অন্তরে ধারণ করে, তখন এর ফলে সে এমন এক খোদার ওপর ইমান আনে — যিনি একক, অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়; সবার জন্য অটল আশ্রয়স্থল; আসমান-জমিন এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক; তাঁর বাদশাহিতে অন্য কোনো শরিক নেই, তাঁর *কুদরতের* কারখানায় অন্য কোনো অংশীদার নেই; দুনিয়ার কোনো কিছুই তাঁর চোখের আড়ালে নয়; জগতের কোনো বিষয় তাঁর হুকুমের বাইরে নয়; প্রতিটি জিনিস তাঁর মুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু — সবই তাঁর দরবারে সেজদাবনত এবং তাঁর *তাসবিহ* ও *তাহলিলে* মশগুল; তাঁর *কুদরত* সীমাহীন, তাঁর প্রশস্ততা অসীম এবং তাঁর ইচ্ছা মহাবিশ্বের অণু-পরমাণুতে কার্যকর; তিনি যখন চান এবং যে জিনিসকে চান ধ্বংস করেন এবং যখন চান তাকে পুনরায় সৃষ্টি করেন; *ইজ্জত* ও *জিল্লত* — সবই তাঁর হাতে; সবাই নশ্বর, তিনিই অবিনশ্বর; তিনি ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে, অথচ ধমনীর রগ থেকেও নিকটে; তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর *কুদরত* প্রতিটি জিনিসকে পরিবেষ্টন করে আছে; তিনি হৃদয়ের গোপন রহস্য পর্যন্ত জানেন; তাঁর ইচ্ছা প্রতিটি ইচ্ছায় কার্যকর এবং তাঁর হুকুম প্রতিটি হুকুমের ঊর্ধ্বে; তিনি প্রতিটি ত্রুটি থেকে মুক্ত, প্রতিটি মন্দ থেকে পবিত্র এবং প্রতিটি কলঙ্ক থেকে মুক্ত।

এই *কামালের* গুণাবলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো: আল্লাহতায়ালার তাওহিদ (একত্ববাদ)। কুরআন মাজিদ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও স্পষ্টতার সাথে তাওহিদের বিষয়ে বর্ণনা করেছে। এমনকি এই

আসমানি কিতাবের সর্বশেষ অধ্যায় আপন বিষয়বস্তুর দিক থেকে যে সুরার মাধ্যমে শেষ হয়েছে, তাতে আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের সামনে প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া হোক যে, আল্লাহ এক, সবার আশ্রয় তিনি, তিনি কারো পিতা নন, পুত্রও নন এবং তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই।

তাওহিদের এই গুরুত্বের কারণেই কুরআন স্পষ্ট করেছে যে, এটা ছাড়া মানুষের কোনো আমল কবুলযোগ্য নয় এবং তাওহিদ ঠিক থাকলে প্রতিটি ভুলের ব্যাপারে ক্ষমা লাভের আশা করা যায়। এর কারণ, তাওহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইমান নিয়ে বান্দা না গুনাহের ব্যাপারে বিদ্রোহী হতে পারে, আর না গুনাহ করে ফেললে তওবা ও *ইস্তিগফারের* তাওফিক থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। সে অবশ্যই প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসবে এবং এভাবে কিয়ামতের হাজিরার আগেই নিজের জন্য ক্ষমা ও মার্জনার যোগ্যতা তৈরি করে নেবে।

তাওহিদের যেসব দলিল কুরআনে এসেছে, সেগুলো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির স্বীকৃত নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট যে, খোদার খোদায়িতে অংশীদার সাব্যস্ত করার জন্য কারো কাছে কোনো দলিল নেই। কুরআন তাঁর শ্রোতাদের নিকট একাধিক স্থানে দাবি করেছে যে, *আকল* ও *নকল* অর্থাৎ বুদ্ধি ও প্রতিষ্ঠিত বর্ণনার ভিত্তিতে এর কোনো দলিল পেশ করতে পারলে অবশ্যই করো। খোদার কোনো শরিক আছে কি নেই, এটার জন্য আসল সাক্ষ্য স্বয়ং খোদার-ই হতে পারে এবং খোদার সাক্ষ্য জানার একমাত্র মাধ্যম হলো তাঁর নাজিলকৃত কিতাবসমূহ এবং সেই সব বর্ণনা ও নিদর্শন, যা তাঁর নবী ও রাসুলদের থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানবজাতির কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেগুলোতে শিরকের সমর্থনের জন্য কোনো সাক্ষ্য বিদ্যমান নেই।

সুনান

আল্লাহতায়ালা বান্দাদের সাথে যে আচরণ করেন এবং যেভাবে করেন, সেটাকে কুরআনে *সুন্নাতে ইলাহি* হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহতায়ালার ইরশাদ এই যে, এই সুন্নাতসমূহ অপরিবর্তনীয়, এগুলোতে কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং খোদার মারেফাতের জন্য যেভাবে তাঁর গুণাবলির জ্ঞান জরুরি, একইভাবে এই *সুন্নাতে ইলাহির* জ্ঞানও জরুরি। এই সুন্নাতসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

১. *ইবতিলা* (পরীক্ষা)

আল্লাহতায়ালা এই দুনিয়া পরীক্ষার জন্য তৈরি করেছেন। খোদার এক বিশ্বজনীন আইনের মর্যাদা হিসেবে এই পরীক্ষা সমগ্র মানবজাতিকে বেষ্টন করে আছে। মানুষের প্রকৃতিতে যা কিছু আমানত রাখা হয়েছে, তা এই পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়, নফসের রহস্যসমূহ এর মাধ্যমেই উন্মোচিত হয় এবং ইলম ও আমলের মর্যাদা এর মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। কুরআনের ইরশাদ এই যে, জীবন ও মৃত্যুর এই কারখানা অস্তিত্বে এসেছে এই জন্য যে, এটার প্রতিপালক দেখে নেন কে অবাধ্যতা অবলম্বন করে, আর কে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে। এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন, কিন্তু তিনি এই সুন্নাত নির্ধারণ করেছেন যে, মানুষের সাথে *জাজা ও সাজা* অর্থাৎ পুরস্কার ও শাস্তির ফয়সালা তিনি কেবল নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে করবেন না। এই পরীক্ষা এই উদ্দেশ্যেই জারি করা হয়েছে।

এই দুনিয়ায় দুঃখ ও সুখ, দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা, কষ্ট ও আরামের যে অবস্থাগুলো মানুষের সামনে আসে, সেগুলো এই আইনের অধীন। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেন এবং

তাদের মধ্য থেকে আসল ও নকলের পার্থক্য করেন। তিনি কাউকে ধন-সম্পদ এবং সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে ভূষিত করেন, তখন তার শোকরের পরীক্ষা নেন, আর কাউকে অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলেন, তখন তার সবর তথা ধৈর্যের পরীক্ষা নেন।

২. হেদায়েত ও গোমরাহি

এই পরীক্ষায় মানুষের কাছে দাবি করা হয়েছে যে, সে গোমরাহি থেকে বাঁচবে এবং নিজের জন্য হেদায়েতের পথ গ্রহণ করবে। কুরআন জানিয়েছে যে, এই হেদায়েত তার *ফিতরাতে* আমানত হিসেবে রাখা আছে। তারপর বিবেক-বুদ্ধির পরিপক্বতার বয়সে পৌঁছার পর জমিন ও আসমানের নিদর্শনসমূহ তাকে এর দিকে মনোযোগী করে। মানুষ যদি এই হেদায়েতের মূল্যায়ন করে, এর থেকে উপকার গ্রহণ করে এবং আল্লাহতায়ালার এই নিয়ামতের জন্য তাঁর শোকরগুজার হয়, তবে খোদার সুন্নাত এই যে, তিনি এর আলো তার জন্য বাড়িয়ে দেন, তার ভিতরে আরও হেদায়েতের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেন এবং এর ফলস্বরূপ নবীগণ (*আলাইহিমুস সালাম*) যে হেদায়েত নিয়ে এসেছেন, তা থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক তাকে দান করেন।

মানুষ যদি এই *ফিতরাতি* তথা সহজাত প্রকৃতির হেদায়েত থেকে বিমুখ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, নিজের বিচার-বুদ্ধি খাটানো থেকে বিরত থাকে এবং জেনে বুঝে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়, তবে কুরআনের পরিভাষায় এটা জুলুম ও *ফিসক* (পাপাচার); আর খোদা কোনো জালিম ও পাপীকে কখনো হেদায়েত দেন না, বরং তাকে গোমরাহির অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেন।

৩. *তাকলিফ মা লা ইয়ুতাক* (সাধ্য-সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট)

নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-দের মাধ্যমে যে শরিয়ত মানুষকে দেওয়া হয়েছে, তাতে আল্লাহতায়ালা নিজের পক্ষ থেকে কখনো এমন কোনো হুকুম দেন না, যা মানুষের সহ্যশক্তির বাইরে। তাঁর সকল কাজে এই মানদণ্ড সবসময় থেকেই কায়েম আছে যে, মানুষের শক্তির চেয়ে বেশি কোনো বোঝা তাদের ওপর চাপানো হবে না; আর যে হুকুমই দেওয়া হবে, তা মানুষের *ফিতরাতের* সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং তার সামর্থ্য মেপে দেওয়া হবে। অতএব ভুলে যাওয়া, ভুল বোঝা এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য এই শরিয়তে কোনো জবাবদিহি নেই; আর মানুষের কাছে এর দাবি শুধু এই যে, প্রকাশ্য ও গোপনে পূর্ণ সত্যবাদিতা ও সততার সাথে তারা তাঁর হুকুম পালন করবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বান্দারা যদি অবাধ্যতা অবলম্বন করে, সে অবস্থাতেও আল্লাহতায়ালা তাদের ওপর এমন কোনো কষ্টকর বোঝা চাপিয়ে দেন না। কুরআন থেকে জানা যায় যে, আদব ও প্রশিক্ষণের জন্য, শাস্তির জন্য অথবা মানুষের মন্দ কাজের ফল তাদের দেখানোর জন্য কিংবা খোদার মুকাবিলায় তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য এ ধরনের কষ্ট অবশ্যই দেওয়া হয়।

৪. *আযল* ও *নাসব* (জাতিসমূহের উত্থান-পতন)

পরীক্ষার যে আইন এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে, তার অধীনে আল্লাহতায়ালা যেভাবে ব্যক্তিদেরকে *সবর* (ধৈর্য) বা শোকরের পরীক্ষার জন্য মনোনীত করেন, একইভাবে জাতিসমূহকেও মনোনীত করেন। এই নির্বাচনের ফলে যখন কোনো জাতি একবার মর্যাদা লাভ করে, তখন আল্লাহ তাদের সাথে তাঁর আচরণ ততক্ষণ পর্যন্ত বদলান না, যতক্ষণ না তারা *ইলম-আখলাক* তথা জ্ঞান ও চরিত্রের দিক থেকে

নিজেদের অবনতিতে নামিয়ে দেয়। এটা খোদার অপরিবর্তনীয় সুন্নাত এবং নিজের এই সুন্নাত অনুযায়ী যখন কোনো জাতিকে বারবার সতর্ক করার পর তিনি *জিল্লতি* (লাঞ্ছনা) ও দুর্ভাগ্যের ফয়সালা করেন, তখন তাঁর এই ফয়সালা কেউ ঠেকাতে পারে না এবং দুনিয়ার কোনো শক্তিও খোদার মুকাবিলায় সেই জাতিকে কোনো সাহায্য করতে পারে না। মানুষের পুরো ইতিহাস বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে এই সুন্নাতের বহিঃপ্রকাশের সাক্ষ্য দেয়।

৫. *নুসরাতে ইলাহি* (আল্লাহর সাহায্য)

আল্লাহতায়ালা যখন নিজের কোনো মিশন কোনো ব্যক্তি বা জামাতের নিকট অর্পণ করেন এবং তাকে তা পূরণ করার হুকুম দেন, তখন তিনি তাকে সাহায্যও করেন। এই মিশন দাওয়াতেরও হতে পারে এবং জিহাদ ও কিতালেরও হতে পারে। এ ধরনের কোনো মিশন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ইমানদারদের সাহায্য করা আল্লাহ নিজের ওপর আবশ্যক করে রেখেছেন। এই সাহায্য উদ্দেশ্যহীনভাবে আসে না, বরং এর একটি নীতিমালা আছে। আল্লাহতায়ালা এই নীতিমালা কুরআনে বর্ণনা করেছে। তাঁর বান্দাদের এই সাহায্য সেই নীতিমালা অনুযায়ীই অর্জিত হয়।

৬. তওবা ও *ইস্তিগফার*

মানুষ যখন কোনো গুনাহ করে ফেলে, তখন তার জন্য তওবা ও *ইস্তিগফারের* সুযোগ রয়েছে। এই বিষয়ের নিয়ম হলো, সে যদি গুনাহ করার পরপরই তওবা করে, তবে আল্লাহতায়ালা তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। কিন্তু তিনি সেইসব মানুষের তওবা কখনোই কবুল করেন না, যারা জীবনভর গুনাহে ডুবে থাকে এবং যখন দেখে মৃত্যু মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তখন তওবার অজিফা পড়তে শুরু করে।

একইভাবে জেনেবুঝে সত্য অস্বীকারকারীদের তওবাও কবুল হয় না, যদি তারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত এই অস্বীকারের ওপর অটল থাকে।

৭. *জাজা ও সাজা* (পুরস্কার ও শাস্তি)

মৃত্যুর পর পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়টি এক অকাট্য বাস্তবতা, কিন্তু কুরআন থেকে জানা যায় যে, কখনো কখনো এটা এই দুনিয়াতেও দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন খোদার আদালত যেভাবে তার পরম পূর্ণতার সঙ্গে প্রকাশ পাবে, এটা তারই ভূমিকা। পুরস্কার ও শাস্তির যে রূপগুলো আল্লাহতায়ালা একেবারে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন, তা হলো:

প্রথমত, যারা দুনিয়া অন্বেষণকারী হয়, এরই জন্য বাঁচে, এরই জন্য মরে এবং আখিরাত থেকে একেবারে উদাসীন হয়ে জীবন অতিবাহিত করে, আল্লাহতায়ালা যাকে যতটুকু চান, সেটুকু দিয়ে তাদের হিসাব এই দুনিয়াতেই চুকিয়ে দেন এবং তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের ফল তারা এখানেই পেয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, রাসুলদের মাধ্যমে *ইতমামে হুজ্জাত* তথা সত্যের চূড়ান্ত উপস্থাপনের তাদের অস্বীকারকারীদের ওপর এই দুনিয়াতেই আজাব নেমে আসে এবং বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহতায়ালা আসমান ও জমিনের বরকতের দরজা খুলে দেন।

তৃতীয়ত, সাইয়্যিদুনা ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*)-এর বংশধরদের জন্য আল্লাহতায়ালার ওয়াদা এই যে, তারা যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে তারা জাতিসমূহের *ইমামত* (নেতৃত্ব) লাভ করবে এবং সত্য থেকে বিচ্যুতির পথ অবলম্বন করলে এই পদ থেকে অপসারিত করে তাদেরকে *জিল্লতি* (লাঞ্ছনা) ও পরাধীনতার আজাবে পতিত করা হবে।

ফেরেশতাদের ওপর ইমান

আল্লাহতায়ালা যে সত্তাগুলোর মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের জন্য তাঁর হুকুম নাজিল করেন, তাদেরকে ফেরেশতা বলা হয়। কুরআনে তাদের জন্য 'আল-মালাইকা' শব্দটি এসেছে। এটা 'মালাক'-এর বহুবচন, যার অর্থ বার্তাবাহক। অতএব, কুরআন থেকে জানা যায় যে, *আলামে লাহুত* (আধ্যাত্মিক জগৎ)-এর সাথে এই *আলামে নাসুত* (বস্তুজগৎ)-এর যোগাযোগ তাদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই জগতের সমগ্র ব্যবস্থাপনা আল্লাহতায়ালা তাদের মাধ্যমেই পরিচালনা করেন। এই পরিচালনা ধরন এই যে, আল্লাহর দরবার থেকে যে হুকুম তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়, তারা তা একেবারে অনুগত দাসের মতো আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে জারি করে। এতে তাদের কোনো ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা কাজ করে না। তারা আপাদমস্তক আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক; সর্বদা নিজেদের প্রতিপালকের *হামদ* ও *সানা* (প্রশংসা)-তে মশগুল থাকে এবং তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে বিন্দু পরিমাণ অবাধ্যতাও করে না।

নবীগণের ওপর ইমান

বনি আদমের জন্য পরিপূর্ণ হেদায়েতের ব্যবস্থা আল্লাহতায়ালা যে সত্তাগুলোর মাধ্যমে করেছেন, তাদেরকে নবী বলা হয়। তারা মানুষই ছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তাঁর *ইলম* ও *হিকমতের* ভিত্তিতে তাদেরকে এই মসনদের জন্য নির্বাচন করেছেন। এটা এক ঐশী দান; শিক্ষা-দীক্ষা, প্রশিক্ষণ কিংবা অর্জন-প্রচেষ্টার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কুরআন থেকে জানা যায় যে, এই মর্যাদায় তারাই নির্বাচিত হন, যারা নফস ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে বাঁচান, গুনাহ থেকে নিরাপদ

থাকেন এবং সব দিক থেকে নিজেদের জাতির সৎকর্মশীল ও উত্তম ব্যক্তি হন।

আল্লাহতায়ালা এই নবীদের প্রত্যেক জাতির নিকট পাঠিয়েছেন। আদম (*আলাইহিস সালাম*)-এর সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছিলেন যে, তার বংশধরদের পথপ্রদর্শনের জন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে হেদায়েত নাজিল করবেন। এই হেদায়েত এই নবীদের মাধ্যমেই বনি আদমকে দেওয়া হয়েছে। তারা আসমান থেকে ওহি লাভ করে মানুষকে সত্য জানাতেন, তার অনুসারীদের শুভ পরিণামের সুসংবাদ দিতেন এবং অবিশ্বাসীদের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতেন।

নবীদের প্রয়োজন এই জন্য ছিল না যে, মানুষ নিজের প্রতিপালককে চিনবে এবং তাকে ভালো-মন্দের পার্থক্য করার বোধ দেওয়া হবে। এগুলো তো তার সৃষ্টির অংশ এবং সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তার *ফিতরাতের* আমানত হিসেবে রাখা আছে। অতএব, এই প্রয়োজন এসব বিষয়ে পরিচয় করানোর জন্য নয়, বরং দুটি কারণে দেখা দিয়েছে:

এক — *ইতমামে হেদায়েত* তথা হেদায়েতকে পূর্ণ করার জন্য। অর্থাৎ মানুষের *ফিতরাতে* যা কিছু সংক্ষেপে আমানত রাখা আছে এবং যা কিছু সে চিরকাল জানে, সেগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় ও বিস্তারিত বিবরণসহ সেগুলো তার জন্য একেবারে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া।

দুই — *ইতমামে হুজ্জাত* তথা সত্যের চূড়ান্ত উপস্থাপনের জন্য। অর্থাৎ মানুষকে গাফিলতি থেকে জাগ্রত করা এবং *ইলম-আকল* তথা জ্ঞান ও বুদ্ধিবিবেকের সাক্ষ্যের পর এসব নবীর মাধ্যমে আরেকটি সাক্ষ্যও পেশ করা — যা হককে এমন

মাত্রায় স্পষ্ট করে দেয় যে, কারও কাছে কোনো অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে।

মুহাম্মদ রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর প্রেরণের মাধ্যমে এই দুটো বিষয় বৈশ্বিক পর্যায়ে এবং একেবারে শেষ স্তরে অর্জিত হয়েছে; তাই নবুয়তের ধারাবাহিকতা চিরতরে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। কুরআন ঘোষণা করেছে যে, আপনি শেষ নবী। আপনার পরে আর কোনো নবী ও রাসুল আসবে না।

এই নবীদের চিনতে সুস্থ স্বভাবের কোনো ব্যক্তির অসুবিধা হয় না। মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ক জাগ্রত থাকলে নবীদের চেহারা ও আওয়াজই *মুজেজা* (অলৌকিক নিদর্শন)। তবুও এর সাথে আল্লাহতায়ালা তাদেরকে এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনও দান করেন যে, বিরোধীরা মুখে স্বীকার না করলেও — তাদের সত্যতার ওপর নিশ্চিত হওয়া ছাড়া তাদের জন্যও আর কোনো পথ অবশিষ্ট থাকে না। কুরআন থেকে জানা যায় যে, এই *বাইয়্যিনাত* (সুস্পষ্ট নিদর্শন) প্রত্যেক নবীকে তার জামানা ও পরিস্থিতির বিবেচনায় দেওয়া হয়। এর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ আমরা এখানে করব।

১. নবী সাধারণত তার পূর্ববর্তী নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং তারই সত্যায়নকারী হিসেবে আবির্ভূত হন। এ দিক থেকে তিনি কোনো অপরিচিত ব্যক্তিত্ব নন। মানুষ তার সাথে পরিচিত থাকে, এমনকি তার অপেক্ষায়ও থাকে। মসিহ (*আলাইহিস সালাম*) সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, সাইয়্যিদুনা ইয়াহইয়া তার নবুওয়ত প্রাপ্তির আগে জেরুজালেমে তার আগমনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর সুসংবাদ *তাওরাত* ও *ইনজিল* — উভয় কিতাবেই বর্ণিত হয়েছে, বরং সাইয়্যিদুনা

মসিহ-এর আগমনের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি বড় উদ্দেশ্য হিসেবে এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি উম্মি-নবীর সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এসেছিলেন। কুরআন নিজের সত্যতার জন্য এটাকে একটা অকাট্য প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছে যে, বনি ইসরাইলের আলেমগণ তাকে সেভাবেই চিনতেন, যেভাবে সন্তানের বিচ্ছেদে কাতর একজন পিতা নিজের প্রতিশ্রুত ও প্রতীক্ষিত পুত্রকে চিনে থাকে। এর অর্থ এই ছিল যে, তারা রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-কেও খুব ভালোভাবেই চিনত।

২. নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আল্লাহর কালাম হিসেবে যা কিছু পেশ করেন, তাতে কোনো বৈপরীত্য ও বিরোধ থাকে না। দুনিয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়ের কোনো প্রতিভাধর ব্যক্তিও নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে এই দাবি করতে পারেন না — তিনি সক্রেটিস ও প্লেটো হোন অথবা কান্ট ও আইনস্টাইন, গালিব ও ইকবাল হোন কিংবা রাজি ও জামাখশারি যাই হোন না কেন। কিন্তু কুরআন নিজের সম্পর্কে এই কথা বলেছে এবং পূর্ণ জোরের সাথেই বলেছে যে, এতে চিন্তা ও ভাবের সামান্যতম বৈপরীত্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীতে কি এমন কোনো মানুষ আছে, যে বছরের পর বছর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং বিভিন্ন সময়ে এমন বিচিত্র বিষয়ে বক্তৃতা করেছে এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার এই সমস্ত বক্তৃতা যখন সংকলন করা হয়, তখন তা এমন এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্যের রূপ ধারণ করে, যাতে না চিন্তার কোনো সংঘাত থাকে, না বক্তার মন ও মস্তিকে সৃষ্ট হওয়া কোনো অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়, আর না মত ও দৃষ্টিভঙ্গি

পরিবর্তনের কোনো চিহ্ন কোথাও পাওয়া যায়? এটা একমাত্র কুরআনের-ই বৈশিষ্ট্য।

৩. নবীকে আল্লাহতায়ালা মুজিজা ও অলৌকিক ক্ষমতা দান করেন। সাইয়্যিদুনা মুসা (*আলাইহিস সালাম*) এবং সাইয়্যিদুনা মসিহ-কে যে অসাধারণ মুজিজা দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে যে, এই মুজিজাগুলো যেসব বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে একটি ছিল এই নবীদের রিসালাত। এই মুজিজাসমূহকে কোনো ব্যক্তি জাদুবিদ্যা বা জ্ঞান ও শিল্পের উৎকর্ষ বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কারণ, এ ধরনের জ্ঞান ও শিল্পের হাকিকত সেগুলোর বিশেষজ্ঞদের চেয়ে ভালো আর কেউ বুঝে না এবং তারাও এগুলোর সামনে নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-কে এই হিসেবে যে মুজিজা দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে: কুরআন। আরবি ভাষার অলংকারশৈলী এবং জ্ঞান ও সাহিত্যধারার সাথে পরিচিত সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যখন কুরআন পড়েন, তখন স্পষ্টভাবে অনুভব করেন যে, এটা কোনো মানুষের বাণী হতে পারে না। ফলশ্রুতিতে একের অধিক স্থানে কুরআন নিজেই তার শ্রোতাদের চ্যালেঞ্জ করেছে যে, তারা যদি তাদের এই ধারণায় সত্যবাদী হয় যে, এটা খোদাতায়ালার কালাম নয়, বরং মুহাম্মদ এটাকে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে পেশ করছেন, তবে এই কালামের যে মর্যাদা ও মান, ঠিক তেমন মর্যাদা ও মানের একটি সুরা তৈরি করে পেশ করুক। তাদের জাতির একজন ব্যক্তি যদি তাদের কথা মতো কোনো বৈজ্ঞানিক ও

সাহিত্যিক পটভূমি ছাড়াই এমনটি করতে পারে, তবে তাদেরও এতে কোনো অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

খোদাতায়ালার এই কিতাব এখনও আমাদের কাছে বিদ্যমান। এর ওপর কমবেশি চৌদ্দ শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ের মাঝে দুনিয়া কী থেকে কী হয়েছে। আদম সন্তান তত্ত্ব ও চিন্তার কত প্রতিমা গড়েছে এবং আবার নিজেই ভেঙেছে। মানুষ ও মহাজগত সম্পর্কে মানুষের ধ্যান-ধারণায় কত পরিবর্তন এসেছে এবং সে গ্রহণ ও বর্জনের কত ধাপ অতিক্রম করেছে। মানুষ কত কত পথ পাড়ি দিয়েছে এবং পরিশেষে কোথায় পৌঁছেছে, কিন্তু এই কিতাব — যাতে এমন অনেক বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে, যা এই গত শতাব্দীতে জ্ঞান ও গবেষণার বিশেষ বিষয়বস্তু ছিল — দুনিয়ার সমগ্র সাহিত্যে এই মুহূর্তে কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা আজও ঠিক তেমনি অনঢ় ও অটল, যেমনটি ছিল আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে। জ্ঞান ও বুদ্ধি কুরআনের সামনে ঐ সময় যেভাবে অক্ষমতা স্বীকারে বাধ্য ছিল, আজও ঠিক তেমনটি-ই আছে। কুরআনের প্রতিটি বর্ণনা আজও পূর্ণ মর্যাদার সাথে নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত। দুনিয়া তার বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সত্ত্বেও কুরআনে কোনো সংশোধন ও পরিবর্তনের কোনো অবকাশ তৈরি করতে পারেনি।

৪. আল্লাহতায়ালা নবীদেরকে এমন কিছু বিষয়ে অবহিত করেন, যা জানা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এর একটি উদাহরণ ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ, যেগুলো বিস্ময়করভাবে পুরোপুরি সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু কুরআনে রয়েছে এবং কিছুর কথা রেওয়ায়েত তথা হাদিসের বর্ণনায় এসেছে। আরব ভূখণ্ডে রাসুল (*সাল্লাল্লাহু*

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিজয়, মক্কা বিজয় এবং মানুষের দলে দলে আল্লাহর ধর্মে প্রবেশের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কুরআনের প্রতিটি শিক্ষার্থীই অবগত। ইরানিদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর রোমানদের পুনরায় বিজয়ী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীটিও ছিল এমনই অনন্য সাধারণ।

এই ভবিষ্যদ্বাণী যখন করা হয়েছিল, তখন 'রোমান সাম্রাজ্যের পতন' [The Decline and Fall of the Roman Empire]-এর লেখক এডওয়ার্ড গিবন-এর ভাষায়: "এই আগাম সংবাদের বাস্তবায়ন অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল, কেননা হেরাক্লিয়াসের প্রথম বারো বছর রোমান সাম্রাজ্যের সমাপ্তির ঘোষণা দিচ্ছিল।" কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক নিজের সময়ে পূর্ণ হয় এবং ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে রোমান শাসক এমন শান-শওকতের সাথে কনস্টান্টিনোপলে ফিরে আসলেন যে, তার রথ চারটি হাতি টানছিল এবং অসংখ্য মানুষ রাজধানীর বাইরে চেরাগ ও জলপাইয়ের শাখা হাতে নিজেদের বীরকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিল।

৫. নবীদের মধ্যে যারা রাসুলের মসনদে অধিষ্ঠিত হন, তারা খোদার আদালত হয়ে আসেন এবং নিজের জাতির ফয়সালা করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এটার ধরন এমন যে, আল্লাহর এই রাসুলগণ যখন নিজেদের প্রতিপালকের অঙ্গীকারের ওপর কায়েম থাকেন, তখন তার পুরস্কার এবং যদি বিচ্যুতি ঘটান, তবে তার সাজা তারা দুনিয়াতেই পেয়ে যান। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, তাদের অস্তিত্ব মানুষের জন্য একটি খোদায়ি নিদর্শনে পরিণত হয় এবং তারা যেন খোদাকে তাদের সাথে জমিনে চলাফেরা করতে এবং বিচার করতে দেখে। এটাই মূলত সে বিষয়, যা তাদের জাতিগুলোর জন্য দুনিয়া ও

আখিরাত — উভয় জগতে খোদায়ি ফয়সালার ভিত্তিতে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে, আল্লাহতায়ালা এই রাসুলদের বিজয় দান করেন এবং তাদের দাওয়াত অস্বীকারকারীদের ওপর নিজের আজাব নাজিল করেন।

এই নবীদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ হলো, তাদের আনুগত্য করা হবে। আল্লাহতায়ালা এই কথা নিজের কিতাবে নিজেই স্পষ্ট করেছেন যে, নবী কেবল ভক্তির কেন্দ্র নন, বরং আনুগত্যেরও কেন্দ্র। তিনি এজন্য আসেন না যে, মানুষ তাকে নবী ও রাসুল হিসেবে মেনে নিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করবে। তার মর্যাদা কেবল একজন উপদেশ প্রদানকারী ও নসিহতকারীর নয়, বরং তার মর্যাদা একজন হেদায়েতকারীর, যার আনুগত্য করা আবশ্যক। তার আগমনের উদ্দেশ্যই এটা যে, জীবনের সমস্ত বিষয়ে তিনি যে হেদায়েত দেন, তা বিনা প্রশ্নে পালন করা হবে। আবার এই আনুগত্য কোনো আনুষ্ঠানিক বিষয় নয়। কুরআনের দাবি হচ্ছে, এই আনুগত্য হতে হবে অনুসরণের আবেগ, পূর্ণ *ইখলাস*, পূর্ণ মহব্বত এবং চরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে।

আসমানি কিতাবসমূহের ওপর ইমান

মানুষের হেদায়েতের জন্য যেভাবে নবী পাঠানো হয়েছে, ঠিক সেভাবেই আল্লাহতায়ালা তাদের সঙ্গে নিজের কিতাবগুলোও নাজিল করেছেন। এই কিতাবগুলো এ জন্য নাজিল করা হয়েছে যে, খোদাতায়ালার হেদায়েত লিখিত আকারে এবং তাঁরই শব্দে মানুষের কাছে বিদ্যমান থাকে — যেন এই কিতাবগুলো হক ও বাতিল পার্থক্য নির্ণয়ে 'মিজান' (মানদণ্ড) হিসেবে গণ্য হয়; মানুষ এর মাধ্যমে

নিজেদের মতপার্থক্যের ফয়সালা করতে পারে এবং এভাবে ধর্মের ব্যাপারে যথার্থ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

বর্তমানে যে সহিফাসমূহ বাইবেল নামে বিদ্যমান, তা থেকে আপাতদৃষ্টিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এই কিতাবগুলো কোনো না কোনোভাবে সকল নবীকে দেওয়া হয়েছিল। কুরআন যেভাবে তাওরাত ও ইঞ্জিলের উল্লেখ করে, একইভাবে সহিফা-এ-ইব্রাহিমের কথাও উল্লেখ করে। এগুলো সবই খোদাতায়ালার কিতাব। অতএব, কোনো প্রকার পার্থক্য ছাড়াই কুরআন সাধারণভাবে এগুলোর ওপর ইমানের দাবি করে।

এই কিতাবগুলোর মধ্যে চারটি কিতাব অনন্য সাধারণ গুরুত্বের অধিকারী — *তাওরাত, যাবুর, ইনজিল* এবং কুরআন। *তাওরাত* মুসা (*আলাইহিস সালাম*), *যাবুর* দাউদ (*আলাইহিস সালাম*) এবং *ইনজিল* মসিহ (*আলাইহিস সালাম*)-এর ওপর নাজিল করা হয়েছে। কুরআন খোদার শেষ নবী মুহাম্মদ (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর ওপর নাজিল হয়েছে। দুনিয়ার ঐশী সাহিত্যের মধ্যে এখন একমাত্র এই কিতাবটি-ই আছে, যার ব্যাপারে এই কথা পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় যে, এটা যেভাবে দেওয়া হয়েছিল, কোনো সামান্য পরিবর্তন ছাড়াই ঠিক সেভাবে, সেই ভাষায় এবং সেই ক্রম অনুযায়ী আজও আমাদের কাছে বিদ্যমান।

প্রতিফল দিবসের ওপর ইমান

ধর্ম যে হাকিকতগুলো মানার দাবি করে, সেগুলোর মধ্যে প্রতিফল দিবসের বিষয়টি অনন্য সাধারণ। নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-দের দাওয়াতে এটাকে মৌলিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত শরিয়ত, নেকি এবং কল্যাণের ভিত্তি এই আকিদাই। নবুয়ত ও রিসালাতের ভিত্তিও

এটার ওপর প্রতিষ্ঠিত। নবী এজন্যই নবী যে, তিনি এই 'নবা-এ-আজিম' তথা মহাসংবাদের খবর দেন। রাসুল এজন্যই রাসুল যে, তিনি এটার পয়গাম নিয়ে আসেন। কুরআন এই প্রতিফল দিবসের-ই সতর্কবাণী ও সুসংবাদের একটি কিতাব। কুরআন মানুষকে জানায় যে, যেভাবে তোমরা ঘুমিয়ে উঠে পড়; যেভাবে মৃত জমিনে পানি বর্ষিত হয় এবং তা চোখের সামনে জীবিত হয়ে ওঠে; যেভাবে তোমরা কিছুই ছিলে না, অথচ এক ফোঁটা পানি থেকে জীবন্ত-জাগ্রত মানুষে পরিণত হয়েছ — ঠিক সেভাবেই তোমাদেরকে একদিন কবর থেকে উঠিয়ে জীবিত করা হবে। এটা করতে তোমাদের প্রতিপালকের সামান্যতম কষ্টও হবে না। কুরআনের শ্রোতারা এটাকে অসম্ভভ মনে করত এবং বলত — এই পচা-গলা, জীর্ণ হাড়গুলোকে কে জীবিত করবে? তখন খোদাতায়ালা জবাব দেন — তিনিই (জীবিত করবেন), যিনি প্রথমবার এগুলো সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর জন্য এটা ঠিক ততটাই সহজ, যতটা সহজ একটি শব্দ বলা।

প্রতিফল দিবসের *শাওয়াহিদ* (প্রমাণাদি), *আলামত* এবং *আহওয়াল* (ঘটনাপ্রবাহ) ও *মাকামাত* (স্থানসমূহ) খুবই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শাওয়াহিদ (প্রমাণাদি)

প্রথম বিষয় হলো, মানুষের ভিতর ভালো-মন্দের অনুভূতি বা চেতনা। এই চেতনার কারণেই তার বিবেকের মধ্যে একজন পাহারাদার প্রতি মুহূর্তে তার মন্দ কাজের ব্যাপারে তাকে সতর্ক করতে থাকে। এটা ছোট একটি আদালত, যা মানুষের ভিতর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ফয়সালা শোনায়। মানুষ এই ফয়সালা মানুক বা না মানুক, সে চিন্তা ও ভাবনা এবং জ্ঞান ও কর্মের প্রতিটি বিচ্যুতি বা হোঁচট খাওয়ার পর এটা অবশ্যই শুনতে পায়,

যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তির তাড়না এতটাই বেড়ে যায় যে, কর্মের কালো ছায়া তার হৃদয়কে আবৃত করে সেটাকে একদম অন্ধ ও বধির করে দেয়। এটা মানুষের ব্যাপারে তার অন্তরের সাক্ষ্য, যাকে 'নফসে লাওয়ামা'-এর সাক্ষ্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কুরআন এটাকে পেশ করে এবং মানুষকে জানায় যে, তুমি কোনো লাগামহীন উট নও যে, যা ইচ্ছা করবে এবং তোমাকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। তোমার জেনে রাখা উচিত যে, যেভাবে এই 'কিয়ামতে সুগরা' (ছোট কিয়ামত) স্বয়ং তোমার ভিতরেই কায়েম আছে, ঠিক তেমনি পুরো মহাবিশ্বের জন্যও একটি কিয়ামত অবশ্যই কায়েম হবে, যেখানে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে এবং যা কিছু তোমরা করেছ, সে অনুযায়ী তোমাদের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির ফয়সালা হবে। তোমরা যদি এটাকে না মানো, তবে তোমরা নিজেদেরই অস্বীকার করো এবং নিজের বিবেকের সাথে প্রতারণা করো।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, মানুষের *ফিতরাত* এটাই যে, সে ইনসাফ চায় এবং জুলুমকে ঘৃণা করে। এতে সন্দেহ নেই যে, এরপরও সে জুলুম করে। কিন্তু এর কারণ এটা নয় যে, মানুষ জুলুম ও ইনসাফের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম কিংবা জুলুমকে ভালোবাসে, বরং এটার কারণ: সে আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরাজিত হয়ে নিজের নফসের ভারসাম্য হারিয়েছে। আমাদের মধ্যে সকলেই জানে যে, মানুষ অন্যের ঘরে সিঁধ কাটে, কিন্তু কখনো চায় না যে, অন্য কেউ তার ঘরে সিঁধ কাটুক; অন্যকে হত্যা করে, কিন্তু কখনো পছন্দ করে না যে, কেউ তার বা তার আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ কেড়ে নিক; অন্যের জন্য ওজনে কম দেয়, কিন্তু নিজের বেলায় কম নিতে কখনো রাজি হয় না। এই চোর, খুনি এবং ঠকবাজদের জিজ্ঞাসা করলে তারাও স্বীকার করবে যে, এগুলোর প্রতিটি অপরাধ এবং এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত। অতএব, কোনো মানুষ সুস্থ

মস্তিষ্কে এই কথায় একমত হতে পারে না যে, সৎ মানুষ আর অপরাধীকে সমান মনে করা হবে এবং উভয়ের সাথে একই আচরণ করা হবে। কুরআন এই বাস্তবতাগুলো সামনে রাখে এবং কিয়ামত অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞাসা করে যে, আমরা কি অনুগত ও অপরাধীদের সমান বিবেচনা করবো? তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেমন ফয়সালা করছ?

তৃতীয় বিষয় হলো, মানুষ এবং মহাবিশ্ব — উভয়ের অপূর্ণতা। এদেরকে যে দিক থেকেই দেখুন না কেন, স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, একদিকে এদের প্রতিটি অণু-পরমাণু থেকে এদের স্রষ্টার মহান *কুদরত* ও মহান *হিকমত* প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিটি জিনিসে থাকা গভীর অর্থবহতা, অতুলনীয় শৃঙ্খলা ও বিন্যাস, অনন্য গণিত ও জ্যামিতি, অসাধারণ আয়োজন এবং অফুরন্ত সৃজনশীল সৌন্দর্য — জ্ঞান ও বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করে। অন্যদিকে, সামগ্রিকভাবে এই দুটোকে বোঝার চেষ্টা করলে চরম হতাশাজনক অপূর্ণতা ও লক্ষ্যহীনতা সামনে চলে আসে। এরপর দুটি পথই খোলা থাকে:

এক — অস্তিত্বের এই কারখানাকে অনর্থক সাব্যস্ত করে এই ফয়সালা করা যে, এটা কোনো খেয়ালি সত্তার খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুই — এটাকে প্রতিফল দিবস (*রোজ-এ-জাজা*) এবং আল্লাহর সেই চিরস্থায়ী বাদশাহির সাথে মিলিয়ে বোঝা, যার ঘোষণা নবীগণ (*আলাইহিমুস সালাম*) দিয়েছেন।

জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকের ফয়সালা কী? যা প্রতিটি মানুষই বুঝতে পারে।

চতুর্থ বিষয় হলো, আল্লাহর গুণাবলি, যাঁর নিদর্শন মহাবিশ্বের প্রতিটি কণাতে প্রকাশ্য। *রবুবিয়াত* (প্রতিপালন) এবং রহমতের গুণাবলি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জগতের প্রতিপালকের পক্ষ

থেকে মানুষের লালনপালনের যে অসাধারণ ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা দেখার পর কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কীভাবে এটা বিশ্বাস করতে পারে যে, তার *খালিক* (স্রষ্টা) তাকে জবাবদিহিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেবেন? *রহমান* ও *রহিম* খোদাতায়ালার কাছে এই প্রত্যাশা কীভাবে করা যায় যে, যারা দুনিয়াকে জুলুম ও অন্যায়ের আখড়া বানিয়েছে, তিনি তাদের কোনো শাস্তি দেবেন না? কুরআন এই কারণে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, কিয়ামত আল্লাহতায়ালার রহমত, *রবুবিয়াত* এবং *কুদরত* ও *হিকমতের* দাবি। আল্লাহকে মানার পর কোনো ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করতে পারে না।

পঞ্চম বিষয় হলো, দুনিয়াতে আল্লাহর 'দিনুনাত' বা খোদায়ি আদালতের বহিঃপ্রকাশ। এই আদালত সেই সত্তাদের অস্তিত্বের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, যাদেরকে নবীদের মধ্য থেকে রাসুলের মসনদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। আল্লাহতায়ালা তাদেরকে অসাধারণ মুজিজা দিয়েছেন, *রুহুল কুদ্দুস* (জিব্রাইল)-এর মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করেছেন, অতঃপর কিয়ামতের আগে তাদের মাধ্যমে একটি 'কিয়ামতে সুগরা' (ছোট কিয়ামত) এই দুনিয়াতেই কায়েম করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল: আখিরাত বা পরকালের ধারণাকেও সেই মানদণ্ডে প্রমাণ করা, যে মানদণ্ডে বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ ল্যাবরেটরির (laboratory) পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

এতে এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহর দরবারে পেশ করার মতো কোনো ওজর বা অজুহাত কারো কাছে অবশিষ্ট থাকতে পারে না। এর পদ্ধতি এমন ছিল যে, এই রাসুলগণ হকের দাওয়াত পেশ করেছেন, অতঃপর ঘোষণা করেছেন যে, তারা নিজ জাতির জন্য আল্লাহর আদালত হয়ে এসেছেন। ইমান ও আমলের ভিত্তিতে পুরস্কার ও শাস্তির যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তা তাদের জাতির সাথে এই দুনিয়াতেই ঘটবে। প্রাকৃতিক নিয়ম যেভাবে অনঢ় এবং সব অবস্থায় বাস্তবায়িত হয়,

আল্লাহর নৈতিক আইনও রাসুলদের পক্ষ থেকে *ইতমামে হুজ্জাত* বা অকাট্য প্রমাণ পেশ করার পর একইভাবে বাস্তবায়িত হবে। অতএব, রাসুলদের জাতির যেসব লোক তাদের দাওয়াত গ্রহণ করবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাত — উভয় জগতেই মুক্তি পাবে এবং তাদের বিরোধীদের ওপর তারা বিজয় লাভ করবে। অন্যদিকে, যারা এই দাওয়াত কবুল করবে না, তারা লাঞ্ছিত হবে এবং তাদের ওপর আল্লাহর আজাব নেমে আসবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী যে সময়ে এবং যে জাতির মাঝে ঘোষিত হয়েছে, তখন এটার চেয়ে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য আর কিছুই ছিল না; কিন্তু এটা প্রতিবারই পূর্ণ হয়েছে এবং এমনভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, মানুষ খোদাতায়ালাকে বিচার করতে দেখেছে এবং আকাশ ও পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ হয়েছে।

কুরআন জানিয়েছে যে, শেষবার এই 'দিনুনাত' তথা খোদায়ি আদালত সপ্তম শতাব্দীতে রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। মানব ইতিহাসের এই বিস্ময়কর ঘটনা এই কারণে অনন্য গুরুত্বের অধিকারী যে, এটা ইতিহাসের আলোতে সংঘটিত হয়েছে। ফলে এর খুঁটিনাটি পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত এবং এর সব পর্যায় যেন চোখের সামনে দৃশ্যমান — যা কোনো ব্যক্তি যখন ইচ্ছা, ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখে নিতে পারে।

আলামত

এই দিন কবে আসবে? কুরআন স্পষ্ট করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা জানে না। এর সময় কেবল তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারেই রয়েছে এবং তিনি তাঁর কোনো নবী বা ফেরেশতাকেও এ বিষয়ে অবহিত করেন না। অবশ্য এর আলামত ও লক্ষণসমূহ কুরআন, হাদিস এবং

প্রাচীন সহিফাসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু আলামত সাধারণ প্রকৃতির এবং কিছু আলামত নির্দিষ্ট ঘটনা ও দুর্ঘটনার ন্যায়। প্রথম প্রকারের আলামতের কিছুই কুরআনে বর্ণিত হয়নি। এগুলোর উল্লেখ হাদিসে এসেছে। দ্বিতীয় প্রকারের আলামতের মধ্য থেকে কেবল একটি বিষয় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং তা হচ্ছে: ইয়াজুজ মাজুজের আত্মপ্রকাশ। অতএব, নিশ্চিত আলামত এটাই। এটা ছাড়া সাধারণভাবে যেসব আলামতের কথা বলা হয়, সেগুলোর কিছু প্রকাশ পেয়েছে এবং বাকিগুলো অবশ্যই প্রকাশ পাবে — যদি রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর দিকে সেগুলোর সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে কোনো ভুল না হয়ে থাকে।

আহওয়াল (ঘটনাপ্রবাহ)

কিয়ামত কীভাবে সংঘটিত হবে? এর বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। আসমান ও জমিনে ওপর দিয়ে কী অতিবাহিত হবে, চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের কী দশা হবে, পৃথিবীতে বসবাসকারী সৃষ্টিজগত কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে এবং মানুষ কীভাবে কবর থেকে উঠে তাদের পালনকর্তার সামনে সমবেত হবে — কুরআনের বহু স্থানে তারই চিত্র তুলে চিত্রিত হয়েছে। জাহেলি যুগের সাহিত্য অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, আরবদের রুচি উপমার চেয়ে চিত্রায়ণের দিকে বেশি ছিল। কুরআন এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছে এবং কিয়ামতের সতর্কবার্তার জন্য এর ভয়াবহতার এমন এক চিত্র এঁকেছে যে, তার পাঠক যেন সেটাকে নিজের চোখের সামনে সংঘটিত হতে দেখছে। এই চিত্রায়ণ থেকে ঘটনাপ্রবাহের যে ক্রমধারা সামনে আসে, তা হলো:

১. মানুষ পূর্ণ নিশ্চিয়তার সাথে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাবে। তাদের কেউ পথে থাকবে, কেউ বাজারে, কেউ কোনো

মজলিসে, আবার কেউ তার ঘরে। কারও কল্পনাতেও থাকবে না যে, বিশ্বব্যবস্থা তছনছ হতে চলেছে; তখনই হঠাৎ শিঙায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে এবং কিয়ামতের কম্পন শুরু হবে। এর ফলে পৃথিবীর জনপদে যা কিছু ঘটবে, তার নকশা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আঁকা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, যখন একের পর এক ভূমিকম্পের ঝটকা আসবে এবং পৃথিবীর অবস্থা এমন এক নৌকার মতো হবে, যা ঢেউয়ের আঘাতে টালমাটাল করে, তখন মানুষের হৃদয় কাঁপতে থাকবে, দৃষ্টি হবে আতঙ্কিত এবং মানুষ এমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও মাতাল হয়ে পড়বে যে, দেখে মনে হবে আল্লাহর আজাবের ভয়াবহতা সবাইকে পাগল করে দিয়েছে।

২. এটাই সেই সময়, যখন বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে পড়তে শুরু করবে। পুরো মহাবিশ্বে এমন এক প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্প হবে, যার ফলে পাহাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে, সমুদ্রগুলো উথলে উঠবে এবং সমস্ত গ্যালাক্সি ও মহাজাগতিক বস্তু নিজ নিজ কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে একে অপরের ওপর আছড়ে পড়বে। চারদিকে এমন এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, যা কল্পনা করা বা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এই ধারা এমন এক সময় পর্যন্ত জারি থাকবে, যা কেবল আল্লাহই জানেন।

৩. এরপর সেই পর্যায় শুরু হবে, যাকে কুরআনে 'সৃষ্টির পুনরুক্তি' বা পুনরায় সৃষ্টি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ফলে এই বিশৃঙ্খলা থেকেই ধীরে ধীরে এক নতুন প্রাকৃতিক ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করবে। সমস্ত মহাজাগতিক বস্তু — পৃথিবী, সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্র এবং কোটি কোটি তারা ও গ্রহের সমন্বয়ে গঠিত গ্যালাক্সিগুলো নতুন নিয়ম-কানুন অনুযায়ী এক নতুন জমিন ও নতুন আসমানে পরিবর্তিত হবে। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী,

এই পর্যায়ে আরও একবার শিঙায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, যার ফলে সমস্ত মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে এবং নিজ নিজ কবর থেকে বেরিয়ে বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য উপস্থিত হবে।

মাকামাত (স্থানসমূহ)

মানুষ এই দিনের হাজিরার জন্য যে সকল পর্যায় অতিক্রম করে এবং এরপর তাকে যেসকল স্থানে রাখা হবে, তার বিস্তারিতও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। মানুষ ক্রমশ সেদিকেই এগিয়ে চলছে। এই সফরের প্রথম পর্যায় হলো মৃত্যু। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর এই পর্যায়টি প্রত্যেক মানুষের ওপর অবধারিতভাবে আসবে। মৃত্যু থেকে পালানোর কোনো পথ নেই। এটা সকালেও আসতে পারে, সন্ধ্যাতেও আসতে পারে; মানুষ তার জন্মের আগে কিংবা জন্মের সাথে সাথেই এর মুখোমুখি হতে পারে। শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য — যেকোনো সময়ে এটা চলে আসে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্য হয়ে এর সামনে মাথা নত করতে হয়। কুরআনে মৃত্যুর হাকিকত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের আসল সত্তা — যাকে কুরআনে 'নফস' বলা হয়েছে এবং যা তার জৈবিক জীবনের বাইরে এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব — সেটাকে শরীর থেকে আলাদা করা হয়। এর জন্য এক বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন, যার অধীনে ফেরেশতাদের একটি পুরো কর্মীবাহিনী আছে। তিনি এসে নিয়মমাফিক প্রাণকে ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করে, যেভাবে একজন সরকারি আমানতদার কোনো বস্তুকে নিজের দখলে নেন।

এই সময়ে মানুষের সাথে যে আচরণ করা হয়, তার উল্লেখও কুরআনে রয়েছে। নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-দের পক্ষ থেকে *ইতমামে হুজ্জাত* তথা সত্য অকাট্যভাবে পৌঁছে দেওয়ার পর, তাদের অস্বীকারকারীদের রুহ ফেরেশতারা প্রহার করতে করতে কবজ করেন

এবং মৃত্যুর সময়ই জানিয়ে দেন যে, তাদের কৃতকর্মের কারণে এখন তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আজাব। অন্যদিকে, যারা রাসুলদের ওপর ইমান আনে এবং কুফর, শিরক ও জুলুম-অন্যায়ের যাবতীয় কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকে, ফেরেশতারা তাদের সালাম দেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন।

এরপরের স্থানগুলোকে *বারযাখ*, হাশরের ময়দান, দোজখ এবং জান্নাত হিসেবে অভিহিত করা হয়।

[বারযাখ]

বারযাখ বলতে সেই অন্তর্বর্তীকালীন সীমাকে বোঝায়, যেখানে মৃতরা কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে। *রেওয়ায়েত* বা হাদিসে 'কবর' শব্দটি রূপক অর্থে এই জগতের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। এতে মানুষ জীবিত থাকবে, কিন্তু এই জীবন হবে দেহহীন। আর রুহের চেতনা, অনুভূতি এবং পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ধরন অনেকটা সে রকম হবে, যেমনটা স্বপ্নের অবস্থায় হয়। কুরআন থেকে জানা যায় যে, যাদের বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হবে — চাই তারা আনুগত্যের চূড়ান্ত মানদণ্ডে সত্যের প্রতি তাদের দায়িত্ব পুরোপুরি আদায়কারী হোক অথবা অবাধ্যতা ও অহংকারের সাথে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী পাপিষ্ঠ হোক — তাদের জন্য এক ধরনের আজাব ও সওয়াব এই জগত থেকেই শুরু হয়ে যাবে। এর কারণ, তাদের কাছ থেকে হিসাব নেওয়া বা তাদের ভালো-মন্দের ফয়সালা করার প্রয়োজন হবে না।

[হাশরের ময়দান]

এরপরের স্থান হলো হাশরের ময়দান। দ্বিতীয়বার শিঙায় ফুঁৎকার দেওয়ার পর সমস্ত মানুষ সেখানে জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে। এই

জীবন রুহ ও দেহ উভয়ের সমন্বয়ে হবে। কুরআন এটাকে 'দ্বিতীয়বারের জীবন' হিসেবে অভিহিত করেছে। এতে মানুষের দুনিয়াবি শরীরকে এমন এক শরীরে রূপান্তরিত করা হবে, যা আল্লাহর চিরস্থায়ী রাজত্বে নিয়ামত বা শাস্তির যেকোন অবস্থায় থাকার উপযোগী হবে; কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব ঠিক তা-ই থাকবে, যা নিয়ে সে আজ জীবিত আছে।

সেদিন সমগ্র মানবজাতিকে তিনটি দলে ভাগ করা হবে:

প্রথমত, সত্যের পথে অগ্রগামী দল;

দ্বিতীয়ত, সাধারণ নেককার বান্দা, যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে;

তৃতীয়ত, সেই অপরাধী দল, যাদের হাত বাঁধা থাকবে এবং পিছন থেকে তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে।

এটাই সেই সময়, যখন হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং সত্যকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণের জন্য সাক্ষী পেশ করা হবে। নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-দেরও সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হবে। মানুষের জিহ্বা, হাত, পা, কান, চোখ এমনকি দেহের লোম পর্যন্ত সাক্ষ্য দেবে। এরপর ফয়সালা শোনানো হবে এবং মানুষকে দোজখ ও জান্নাতে পাঠানো হবে।

[দোজখ]

দোজখ সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা হলো, এটা নিকৃষ্টতম আবাসস্থল। এতে আগুনের আজাব হবে। এই আগুন মুখমণ্ডল ঝলসে দেবে, চেহারা বিকৃত করবে, চামড়া তুলে ফেলবে এবং হৃদয় পর্যন্ত

পৌঁছে যাবে। অপরাধীদের গলায় থাকবে বেড়ি এবং পায়ে থাকবে জিঞ্জির; প্রতিটি বিষয় আক্ষেপে পরিণত হবে। সবচাইতে বড় বিষয় হলো, মানুষ সেখানে আল্লাহতায়ালার দিদার তথা দর্শন ও তাঁর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে; তিনি এদের মধ্যে কিছু অপরাধীর দিকে তাকানোও পছন্দ করবেন না।

[জান্নাত]

এর বিপরীতে জান্নাত হলো নেককারদের আবাসস্থল। এর প্রশস্ততা পুরো মহাবিশ্বের সমান। এটা চিরস্থায়ী সুখের জায়গা, যেখানে জীবনের সাথে মৃত্যু, আনন্দের সাথে বেদনা, খুশির সাথে দুঃখ, প্রশান্তির সাথে অস্থিরতা, আরামের সাথে যন্ত্রণা এবং নিয়ামতের সাথে শাস্তির কোনো কল্পনাও নেই। এর আরাম চিরস্থায়ী, এর স্বাদ অন্তহীন, এর রাত-দিন চিরন্তন, এর নিরাপত্তা শাশ্বত, এর আনন্দ অক্ষয়, এর সৌন্দর্য চিরযৌবনা এবং এর পূর্ণতা অসীম। আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সেখানে এমন সব কিছু প্রস্তুত রেখেছেন, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে কখনও তার কল্পনাও আসেনি।

২. আখলাকিয়াত (নীতি ও নৈতিকতা)

ইমানের পর ধর্মের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো — *তাযকিয়ায়ে আখলাক* তথা নৈতিক পরিশুদ্ধি। এর অর্থ হচ্ছে: স্রষ্টা এবং সৃষ্টি — উভয়ের সাথে মানুষের যে আচরণ ও কর্ম সম্পৃক্ত রয়েছে, সেটাকে পরিশুদ্ধ করা। এই জিনিসকেই 'আমলে সালেহ' তথা সৎকর্ম বলা হয়। সম্পূর্ণ শরিয়ত এরই একটি শাখা। সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে শরিয়ত নিঃসন্দেহে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু ইমান ও *আমলে সালেহ* (সৎকর্ম)-ই আসল ধর্ম হওয়ায় এই দুটোতে কখনো কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়নি। কুরআন এই বিষয়ে একেবারে স্পষ্ট, যে ব্যক্তি এই দুটো জিনিস (তথা ইমান ও আমলে সালেহ) নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, তার জন্য থাকবে জান্নাত এবং সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে।

এর সাথে কুরআন এই কথাও স্পষ্ট করেছে যে, আল্লাহতায়ালা যেমন মানুষকে দেখার জন্য চোখ ও শোনার জন্য কান দিয়েছেন, ঠিক তেমনি ভালো ও মন্দকে আলাদা করে চেনার জন্য একটি নৈতিক বোধও দান করেছেন। মানুষ কেবল একটি প্রাণী ও যুক্তিবাদী সত্তা নয়, বরং এর পাশাপাশি সে একটি নৈতিক সত্তাও বটে। এর তাৎপর্য হচ্ছে: ভালো ও মন্দের পার্থক্য এবং ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ হিসেবে অনুভবের ক্ষমতা মানুষের সৃষ্টির সময়ই তার মন ও মস্তিষ্কে *ইলহাম*

(তথা সঞ্চারিত) করা হয়েছে। [ভালো ও মন্দের] এই পার্থক্যবোধ সার্বজনীন বাস্তবতা। ফলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিও যখন পাপ করে, তখন সে প্রথম দিকে গোপনের চেষ্টা করে। নেক কাজের বিষয়টিও এমন। মানুষ এটাকে ভালোবাসে, এটার জন্য নিজের মাঝে সম্মান ও শ্রদ্ধার অনুভূতি খুঁজে পায় এবং যখনই কোনো সমাজ তৈরি করে, তাতে সত্য ও ইনসাফের জন্য অবশ্যই কোনো না কোনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এটা এই সত্যের পরিষ্কার প্রমাণ যে, ভালো ও মন্দের এই পার্থক্য মানুষের *ফিতরাতের* অন্তর্গত। এতে সন্দেহ নেই যে, মানুষ কখনো কখনো মন্দের পক্ষে অজুহাত বানায়। কিন্তু যখন সে অজুহাত বানায়, তখনই সে জানে যে, এই অজুহাত সে নিজের *ফিতরাতের* বিরুদ্ধে বানাচ্ছে। কারণ, ঐ একই মন্দ কাজ যদি কেউ তার সাথে করে, তবে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছাড়াই সেটাকে সে মন্দ বলবে এবং সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবে।

[ভালো ও মন্দের পার্থক্যকরণের] এই অন্তর্নিহিত জ্ঞানের ব্যাখ্যায় অবশ্য ব্যক্তি, সময় ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে অনেক পার্থক্য হতে পারত। আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ যে, তিনি সেটারও অবকাশ রাখেননি এবং যেখানে বড় কোনো মতপার্থক্যের আশঙ্কা ছিল, সেখানে তাঁর নবীদের মাধ্যমে ভালো ও মন্দকে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই নবীদের হেদায়েত এখন কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন মাজিদে সংরক্ষিত। মানুষ নিজের মধ্যে যা কিছু পায়, এই হেদায়েত তার সত্যতা নিশ্চিত করে। মানুষের সহজাত জ্ঞান, এমনকি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, জীবন-আচার ও অবস্থা থেকে আহরিত জ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান — সবই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ফলে নৈতিক গুণাবলি ও মন্দ বিষয়াদি এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে নির্ধারিত হয়ে যায়।

মৌলিক নীতিমালা

এই অধ্যায়ে যে জিনিসটি মৌলিক নীতির মর্যাদা রাখে, তা হচ্ছে, আল্লাহতায়ালা মানুষকে *আদল* ও *ইহসান* করার এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন, আর *ফাওয়াহিশ* (অশ্লীলতা), *মুনকার* (মন্দ কাজ) এবং অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন। এই বিষয়গুলো সম্পূর্ণ *ফিতরি* বা মানবীয় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল, আর তাই আল্লাহর ধর্মে এগুলো সব সময় স্বীকৃত ছিল। *তাওরাতের* দশ নির্দেশ [Ten Commandments] এগুলোর ওপরই ভিত্তিশীল এবং কুরআনও নিজের সকল নৈতিক বিধানে এগুলোরই বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। আমরা এখানে এগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করব।

প্রথম বিষয়: *আদল*। এর অর্থ, যার ওপর যে হক *ওয়াজিব* তথা আবশ্যকভাবে অর্পিত হয়েছে, তা সামান্য হেরফের এবং পক্ষপাত ছাড়া আদায় করা — হোক সে হকদার দুর্বল বা শক্তিশালী এবং আমরা তাকে পছন্দ করি বা না করি।

দ্বিতীয় বিষয়: *ইহসান*। এটা আদলের চেয়েও উচ্চতর একটি বিষয় এবং সমস্ত নৈতিকতার সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা। এটার অর্থ শুধু অধিকার আদায় করা নয়, বরং পারস্পরিক সমঝোতা ও উদারতার আচরণ করা। অন্যের প্রাপ্য হক থেকে তাকে কিছু বেশি দেওয়া এবং নিজের প্রাপ্য হক থেকে কিছুটা কম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। এই গুণটি সমাজে প্রীতি ও ভালোবাসা, ত্যাগ ও একাগ্রতা, কৃতজ্ঞতা, উদারতা ও কল্যাণকামিতার মূল্যবোধ গড়ে তোলে এবং জীবনে মাধুর্য ও সুখ বয়ে আনে।

তৃতীয় বিষয়: আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় করা। এটা *ইহসানের* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা এবং *ইহসানের* একটি বিশেষ রূপ

নির্ধারণ করে। এটার অর্থ: আত্মীয়-স্বজন কেবল এতটুকুর হকদার নয় যে, তাদের সাথে *আদল* ও *ইহসানের* আচরণ করা হবে, বরং তারা এটারও হকদার যে, মানুষ তাদের সম্পদে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার স্বীকার করবে, কোনো অবস্থাতে তাদের ভুখা-নাঙ্গা অবস্থায় ফেলে রাখবে না এবং নিজ সন্তান-সন্ততির পাশাপাশি তাদের প্রয়োজনকেও যথাসম্ভব উদারতার সাথে মেটানোর চেষ্টা করবে।

এগুলোর বিপরীতে তিনটি বিষয় রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রথমটি *ফাওয়াহিশ*। এর অর্থ: ব্যভিচার, সমকামিতা এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

দ্বিতীয়টি *মুনকার*। যেসব কাজকে মানুষ সাধারণভাবে মন্দ জানে, সব সময় মন্দ বলে এসেছে এবং যেগুলোর মন্দ হওয়াটা এতই স্পষ্ট যে, এর জন্য কোনো যুক্তির প্রয়োজন হয় না — সেগুলোই *মুনকার*। ধর্ম ও জাতি, *তাহজিব-তামাদ্দুন* তথা সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিটি ভালো ঐতিহ্যে এগুলোকে মন্দ বিবেচনা করা হয়। কুরআন এগুলোর জন্য এক জায়গায় 'মুনকার' এবং অন্য জায়গায় 'ইছম' শব্দ ব্যবহার করে স্পষ্ট করেছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত কাজ, যা অন্যের অধিকার হরণ করে।

তৃতীয়টি অবাধ্যতা। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজের শক্তি, ক্ষমতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহার করে অবৈধ ফায়দা লুটা, সীমালঙ্ঘন করা এবং অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করা — হোক তা স্রষ্টার বা সৃষ্টির অধিকার।

নৈতিকতার গুণাবলি ও মন্দ দিকসমূহ

[উপরে বর্ণিত] মৌলিক নীতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে কুরআন এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, কোনটি নৈতিক গুণাবলি এবং কোনটি নৈতিক মন্দ দিক, তা সুনির্দিষ্টভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়। এগুলো যেখানে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে আলোচনার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে শিরকের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে এবং এটার সমাপ্তি ঘটেছে এই একই বিষয়ে পুনরায় জোর দেওয়ার মধ্য দিয়ে। কোনো বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরতে কুরআনে এই বাচনভঙ্গিটি ব্যবহৃত হয়। এর উদ্দেশ্য: মাঝখানে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর জন্য তাওহিদের এই বিশ্বাসটি যেন এক প্রকার সুরক্ষা প্রাচীর — যার অস্তিত্বে শহর টিকে থাকে এবং যাতে ফাটল ধরলে সমগ্র শহর বিপদের মুখে পড়ে। এতে সন্দেহ নেই যে, নৈতিক গুণাবলির ক্ষেত্রে তাওহিদের মর্যাদা এমনই। এটা সেই *আদলের* সবচেয়ে বড় এবং মৌলিক দাবি, যার নির্দেশ কুরআন দিয়েছে। মূলত, এই কারণেই শিরককে 'জুলমে আজিম' (মহাপাপ) বলা হয়েছে এবং এর এই পরিণতির কথাও কুরআন পূর্ণ স্পষ্টতার সাথে জানিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহতায়ালার কাছে এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, যার শাস্তিস্বরূপ মানুষ বিতাড়িত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

এই 'শিরক' কী? যখন আল্লাহতায়ালার সাথে কাউকে *ইলাহ* (উপাস্য) বানানো হয়, তখন সেটাকে কুরআন তার পরিভাষায় 'শিরক' বলে অভিহিত করে। এটার অর্থ: কাউকে খোদার সত্তা থেকে অথবা খোদাকে কারো সত্তা থেকে উদ্ভূত মনে করা, কিংবা সৃষ্টিকর্ম বা সৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় কারো অংশী স্বীকার করা কিংবা এভাবে কোনো না কোনো পর্যায়ে কাউকে আল্লাহতায়ালার সমান মর্যাদা দেওয়া।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ: সাইয়্যিদুনা ঈসা মসিহ, সাইয়্যিদা মরিয়ম কিংবা ফেরেশতাদের ব্যাপারে খ্রিস্টান ও মুশরিক আরবদের বিশ্বাস। সুফি মতাদর্শের ওহদাতুল ওজুদ নামক ধারণাও এই শ্রেণিভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ: হিন্দুদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; এবং মুসলমানদের সমাজে *গাউস, কুতুব, আবদাল, দাতা, গরিব নেওয়াজ* প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের প্রতি থাকা বিশ্বাস। এছাড়া অপশক্তির প্রভাব, গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব ও শয়তানদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকেও এরই অন্তর্ভুক্ত মনে করা উচিত।

এছাড়া এই অধ্যায়ে যেসব বিধান এসেছে, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

আল্লাহর ইবাদত

প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, যখন আল্লাহ ছাড়া কোনো *ইলাহ* (উপাস্য) নেই, তখন কেবল তাঁরই ইবাদত হওয়া উচিত। এই ইবাদতের বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, ইবাদতের প্রকৃত স্বরূপ: বিনয় ও নম্রতা, যার প্রাথমিক প্রকাশ ঘটে উপাসনার মাধ্যমে। এরপর মানুষের ব্যবহারিক সত্তার বিবেচনায় এই উপাসনার মধ্যে আনুগত্যও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

প্রথম অবস্থার প্রকাশ: *তাসবিহ* [আল্লাহর মাহাত্ম বর্ণনা] ও *তাহমিদ* [আল্লাহর গুণকীর্তন করা], দোয়া ও মোনাজাত, রুকু ও সেজদা, *নজর* [মানত করা], *নিয়াজ* [উৎসর্গ করা], কুরবানি ও *ইতিকাফ*।

দ্বিতীয় অবস্থায়, মানুষ কাউকে খোদায়ি কর্তৃত্বের অধিকারী মনে করে এবং স্বতন্ত্র বিধানদাতা ও শাসক হিসেবে তার প্রতিটি আদেশের নিকট মাথা নত করে।

বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর সিদ্ধান্ত হচ্ছে: এর মধ্যে কোনো একটি বিষয়ও তিনি ছাড়া অন্য কারো জন্যে হতে পারবে না। অতএব, কেউ যদি কারো *তাসবিহ* ও *তাহমিদ* করে, কিংবা তার কাছে দোয়া ও মোনাজাত করে, অথবা তার জন্য রুকু ও সেজদা করে, কিংবা তার উদ্দেশ্যে *নজর-নিয়াজ* বা কুরবানি পেশ করে, বা তার জন্য *ইতিকাফে* বসে, অথবা খোদায়ি কর্তৃত্বের অধিকারী মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করে, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে: ঐ ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার এই ফয়সালাকে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা। এই শিক্ষা সকল *ইলহামি* তথা ঐশী গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, মানুষের ওপর পিতামাতার হকই সবচেয়ে বড়। তাই আল্লাহর ইবাদতের পর সর্বপ্রথম এটা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর কারণ, পিতামাতাই হলেন মানুষের জন্য তার অস্তিত্বে আসা ও লালিত-পালিত হওয়ার মাধ্যম। আল্লাহতায়ালা পিতামাতা উভয়ের ব্যাপারে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা হলো: নিজের প্রতিপালকের পরে মানুষ যেন তাদের প্রতিই সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই কৃতজ্ঞতা কেবল মুখে প্রকাশ করলেই হয় না, বরং এর কিছু অপরিহার্য দাবি রয়েছে, যেগুলো কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম কথা এটা বলা হয়েছে যে, পিতামাতার সাথে এমন ব্যবহার করতে হবে যেন প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাদের সম্মান করা হয়,

তাদের বিরুদ্ধে মনে কোনো বিরক্তি সৃষ্টি না হয়, তাদের সামনে অমর্যাদাকর কোনো কথা বলা না হয়; বরং [তাদের সাথে আচরণের বেলায়] কোমলতা, ভালোবাসা, ভদ্রতা ও সৌজন্যতার পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাদের কথা মান্য করতে হবে এবং বার্ধক্যের অসহায়ত্বে তাদেরকে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রদান করতে হবে।

দ্বিতীয় কথা এটা বলা হয়েছে যে, পিতামাতার সামনে আনুগত্য ও বাধ্যতার বাহু সকল অবস্থাতেই নত থাকবে এবং এই আনুগত্য ও বাধ্যতা সম্পূর্ণ স্নেহ-ভালোবাসা, দয়া ও মমতার অনুভূতি থেকে হবে। পিতামাতা পাখির মতো তাদের সন্তানকে যেভাবে নিজেদের ডানায় আগলে রাখেন, সন্তানদেরও উচিত বৃদ্ধ বয়সে একইভাবে নিজেদের ভালোবাসা ও আনুগত্যের ডানায় তাদেকে আগলে রাখা। কারণ, পিতামাতার মমতার হক যদি কিছুটা পরিশোধ করা সম্ভব হয়, তা কেবল এই অনুভূতি থেকেই সম্ভব হতে পারে। এটা ছাড়া এই হক আদায় কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

তৃতীয় কথা এটা বলা হয়েছে যে, এর পাশাপাশি তাদের জন্য সর্বদা দোয়া করতে হবে: হে রব! যেমনিভাবে তারা স্নেহ ও মমতা দিয়ে আমাদের শৈশবে লালন করেছেন, ঠিক তেমনি তাদের বার্ধক্যে আপনি তাদের ওপর আপনার রহমত নাজিল করুন। এই দোয়া পিতামাতার হক এবং সেই হকের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়, যা পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কের ওপর অর্পিত হয়। আবার এটা সেই ভালোবাসার অনুভূতির সঞ্চালকও বটে, যা আল্লাহতায়ালা পিতামাতার সাথে সদাচরণের ক্ষেত্রে দাবি করেছেন।

পিতামাতা ছাড়াও এই দুনিয়ায় যেসব সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেগুলোর প্রতিও মানুষের আচরণ ধাপে ধাপে এমনই হওয়া উচিত। আত্মীয়স্বজন, এতিম ও মিসকিন, প্রতিবেশী, মুসাফির ও অধীনস্থদের ব্যাপারেও আল্লাহতায়ালা মানুষকে এই নসিহত করেছেন।

আল্লাহর পথে ব্যয় (*ইনফাক*)

তৃতীয় নির্দেশ হলো, আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এর অর্থ: আল্লাহতায়ালা মানুষকে যে সকল নিয়ামত দান করেছেন, সে যেভাবে সেগুলো নিজের জন্য ব্যয় করে, ঠিক তেমনি ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক প্রয়োজন মিটানোর পর সে যেন সেগুলো অন্য মানুষের জন্যও ব্যয় করে। কুরআন থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই দুনিয়ায় আল্লাহর বান্দা হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন:

এক. স্রষ্টার সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

দুই. সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক সঠিকভাবে গড়ে ওঠা।

প্রথমটি অর্জিত হয় নামাজের মাধ্যমে, যা আল্লাহতায়ালার সাথে বান্দার ভালোবাসার প্রাথমিক বহিঃপ্রকাশ। দ্বিতীয় জিনিসটি অর্জিত হয় ব্যয়ের মাধ্যমে, যা তাঁর সৃষ্টির প্রতি [বান্দার] ভালোবাসার প্রাথমিক প্রকাশ। এর প্রতিদানও হয় আল্লাহর ভালোবাসা। কারণ, মানুষ যা কিছু ব্যয় করে, প্রকৃতপক্ষে তা আসমানে সঞ্চয় করতে থাকে এবং সাইয়্যিদুনা মসিহ (*আলাইহিস সালাম*)-এর বাণী অনুসারে, এটার কারণে মানুষের মনও সেখানেই আবদ্ধ থাকে।

এই ব্যয় হচ্ছে: আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিনদের হক, যা আদায় করা অপরিহার্য। এতে অবহেলা করলে মানুষকে আল্লাহতায়ালার দৃষ্টিতে [অন্যের] অধিকার হরণের অপরাধে অপরাধী বানাতে পারে। কুরআন এই কথা অন্যত্র স্পষ্টভাবে বলেছে: যদি কেউ

এসব হক উপেক্ষা করে ধন-সম্পদ জমা করে, তবে তা হবে: *কানয* [*পুঞ্জীভূত সম্পদ*] এবং এর শাস্তি জাহান্নামের আগুন, যা থেকে প্রত্যেক মুমিন বান্দার উচিত নিজ রবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

এই ব্যয়ের তাওফিক তাদেরই হয়, যারা নিজের খরচে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং আল্লাহতায়ালা যে রিজিক তাদেরকে দান করেন, সেটাকে নিজের কোনো কৌশল বা প্রজ্ঞার ফল নয়, বরং সেটাকে আল্লাহর অনুগ্রহের ফল মনে করে। এরসাথে আরও দুইটি কথা বলা হয়েছে:

এক — সম্পদকে যত্রতত্র উড়িয়ে দেওয়া জায়েজ নয়। এটা আল্লাহর নিয়ামত এবং এর ব্যাপারে সঠিক আচরণ হলো: ভারসাম্য বজায় ও সাশ্রয়ী হওয়ার মাধ্যমে মানুষ নিজের বৈধ প্রয়োজনে সম্পদ ব্যয় করবে এবং যা কিছু বাঁচাবে, সেটাকে হকদারদের আমানত মনে করবে এবং এই আমানত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদায় করবে। এর কারণ, যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যের নীতি অবলম্বন করে না, সে নিজের শখ মেটানো থেকে অবসর পায় না যে, অন্যদের অধিকার আদায় করবে। বলা হয়েছে, যারা নিজেদের সম্পদ এভাবে উড়ায়, তারা শয়তানের ভাই; এবং শয়তান তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করে নিজের পথে লাগিয়ে দেয় এবং তাদের দিয়ে এমনসব কাজে খরচ করায়, যার দ্বারা তারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে তাঁর অসন্তুষ্টি নিয়ে ফিরে আসে। এই বিষয়ে সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ না নিজের হাত একেবারে গুটিয়ে নেবে, আর না একেবারে খুলে বসবে, যেন

প্রয়োজনের সময় নিরূপায় ও লজ্জিত হয়ে বসে থাকতে হয়; বরং ভারসাম্যের সাথে খরচ করবে এবং সবসময় কিছু বাঁচিয়ে রাখবে, যেন নিজের এবং অন্যদের হক যথাসময়ে আদায় করতে পারে।

দুই — রিজিকের সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা আল্লাহতায়ালার প্রজ্ঞা ও ইচ্ছার অধীন। মানুষের দায়িত্ব কেবল এটাই যে, সে পূর্ণ মেহনতের সাথে এর উপায়-উপকরণ সৃষ্টি। যারা এই বাস্তবতা বোঝে না, তারা অন্যদের জন্য খরচ করা তো দূরের কথা — অনেক সময় এমন পাষাণ হয়ে যায় যে, দারিদ্র্যের আশঙ্কায় নিজের সন্তানদের পর্যন্ত হত্যা করে। এতে বিশেষভাবে আরব জাহেলিয়াতের সময় মেয়েদের জীবন্ত কবর দেওয়ার সেই নিষ্ঠুর প্রথার দিকে ইশারা রয়েছে, যার বড় কারণ এটাই ছিল যে, তারা মনে করত নারী যেহেতু উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নয়, তাই তার লালন-পালনের বোঝা কেন কাঁধে নেওয়া হবে। [*কুরআনে*] ঘোষণা করা হয়েছে, তাদেরকে হত্যা করো না, তাদেরও আমরাই রিজিক দিই এবং তোমাদেরও; এবং নিশ্চিন্ত থাকো যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতিটি অবস্থার পর্যবেক্ষক এবং তাদের রক্ষক। তিনি তাদের ব্যাপারে বেখবর নন।

সতীত্ব ও চারিত্রিক পবিত্রতা

চতুর্থ নির্দেশ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি যেন জিনা-ব্যভিচারের ধারে-কাছেও না যায়। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এটা প্রকাশ্য অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ। এটার তাৎপর্য হচ্ছে: জিনা-ব্যভিচার যে মন্দ ও অশ্লীল কাজ — তার জন্য কোনো দলিল ও প্রমাণের

প্রয়োজন নেই। মানুষের *ফিতরা'ত* এটাকে সবসময় বড় গুনাহ ও গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করে আসছে এবং এই *ফিতরা'ত* যতক্ষণ না পুরোপুরি বিকৃত হচ্ছে, ততক্ষণ এভাবেই গণ্য করতে থাকবে। মানুষের ব্যাপারে এই বাস্তবতা একেবারেই অনস্বীকার্য যে, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি তার জন্য পানি ও বাতাসের মতোই অপরিহার্য প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠানটি সঠিক মানবীয় অনুভূতির সাথে কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং টিকে থাকতে পারে, যখন স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক স্থায়ী সাহচর্যের হয়। এই জিনিসটি হারিয়ে গেলে তা থেকে মানবীয় ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিবর্জিত পশুদের একটি পাল অস্তিত্বে আসতে পারে, কিন্তু তা থেকে কোনো সুস্থ সমাজ এবং সুস্থ সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না।

এই কাজের বীভৎসতার কারণেই আল্লাহতায়ালা কেবল এতটুকু কথা বলেননি যে, জিনা-ব্যভিচার করো না, বরং বলেছেন যে, জিনা-ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যেও না। অর্থাৎ এমন সব বিষয় থেকে দূরে থাকো, যা জিনা-ব্যভিচারকে উসকে দেয়, এর প্রতি প্ররোচনা সৃষ্টি করে এবং এর কাছে নিয়ে যায়। নারী-পুরুষের মেলামেশার যে আদব কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তা মূলত মানুষকে এ ধরনের বিষয় থেকে বাঁচাতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলোর সারকথা হচ্ছে: পুরুষ ও নারী উভয়েই নিজ নিজ শারীরিক ও মানসিক চাহিদার নিরিখে নিজেদের দৃষ্টিকে যতটা সম্ভব সংযত রাখবে এবং নিজের দেহের লজ্জাস্থানসমূহ যতদূর সম্ভব ঢেকে রাখবে; আর এমন কোনো কথা বলবে না, যা একে অন্যের যৌন আবেগকে উসকে দেয়। এর কারণ, শয়তান যখন কোনো সমাজে জিনা-ব্যভিচারকে সাধারণ করতে চায়, তখন তার আক্রমণের সূচনা সাধারণত এসব বিষয় থেকেই করে। কুরআন থেকে জানা যায় যে, আদম ও হাওয়ার বেলায় শয়তান এই পথেই আক্রমণ চালিয়েছিল। এই কারণেই আল্লাহতায়ালা জিনা-

ব্যভিচারের প্রচার-প্রসার এবং এর জন্য প্ররোচনা সৃষ্টির চেষ্টাকে বড় অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

মানুষের জীবনের পবিত্রতা

পঞ্চম নির্দেশ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি যেন কাউকে হত্যা না করে। ধর্ম ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের যে পবিত্রতা ও মর্যাদা সবসময় স্বীকৃত ছিল, এটা তারই বর্ণনা। কুরআন জানিয়েছে যে, মানুষের জীবনের পবিত্রতার বিষয়ে ইতিপূর্বে বনি ইসরাইলকে একই তাগিদ দেওয়া হয়েছিল এবং আল্লাহতায়ালা তাদের ওপর এটা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন যে, একজন মানুষকে হত্যা করা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার সমান।

এর সাথে কুরআন এ কথাও স্পষ্ট করেছে যে, এই অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপার কেবল আল্লাহতায়ালার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের সাথেও সংশ্লিষ্ট; এবং আল্লাহতায়ালা তাদেরকে পূর্ণ এখতিয়ার দিয়েছেন। তাই দুনিয়ার কোনো আদালত তাদের ইচ্ছা ব্যতিরেকে হত্যাকারীকে ছাড় দিতে পারে না। আদালতের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা যদি *কিসাস* তথা রক্তের বদলে রক্তের ব্যাপারে জোর দেয়, তবে তাদেরকে সহায়তা করা এবং তারা যা চায়, তা পূর্ণ শক্তি দিয়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ

ষষ্ঠ নির্দেশ হচ্ছে, এতিমের সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এই নির্দেশের শব্দগুলো ঠিক সেগুলোই, যা উপরে জিনা-ব্যভিচার থেকে বিরত রাখার জন্য এসেছে। অর্থাৎ এতিমের কল্যাণ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পদের ধারে-কাছেও যেও না। এর তাৎপর্য হচ্ছে,

এতিমের সম্পদে কেবল ঐ হস্তক্ষেপ-ই জায়েজ, যা তার সুরক্ষা ও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করা হয় এবং ততক্ষণই করা যাবে, যতক্ষণ না এতিম সাবালকত্বে পৌঁছে নিজের সম্পদের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করার যোগ্য হয়।

অঙ্গীকার রক্ষা করা

সপ্তম নির্দেশ হচ্ছে, যে অঙ্গীকারই করা হোক না কেন, তা সর্বাবস্থায় পূরণ করতে হবে। বলা হয়েছে যে, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কুরআনের কিছু জায়গায় এই বিধান একই গুরুত্বের সাথে এসেছে। জিহাদ ও *কিতালের* (যুদ্ধ) ক্ষেত্রেও কুরআনে বর্ণিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হচ্ছে: এই অঙ্গীকার পালন। রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) এবং তার সাহাবিদেরকে এক পর্যায়ে আরবের মুশরিকদের সাথে করা সমস্ত চুক্তি শেষ করে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানেও এই কথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কোনো চুক্তি যদি মেয়াদের শর্তসহ করা হয়ে থাকে, তবে তার মেয়াদ অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। আরেক জায়গায় আরও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো চুক্তিবদ্ধ জাতি যদি মুসলমানদের ওপর জুলুমও করে, তবুও চুক্তি ভঙ্গ করে মজলুমদেরকে সাহায্য করা যাবে না।

পরিমাপ ও ওজনে সততা

অষ্টম নির্দেশ হচ্ছে, পরিমাপ ও ওজনে কমবেশি করা যাবে না। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন, তিনি আসমান ও জমিনকে একটি *মিজান* তথা ন্যায্য মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন; অতএব এটা অপরিহার্য যে, মানুষও নিজের এখতিয়ারভুক্ত ক্ষেত্রে ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সবসময় সঠিক মাপে মাপবে এবং ঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এতে স্পষ্ট যে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি

বিধান এবং নিজের হাকিকতের বিচারে এটা সেই ইনসাফের মানদণ্ডের শাখা, যার ওপর এই দুনিয়া টিকে আছে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি এটা থেকে বিচ্যুত হয়, তবে এর অর্থ হচ্ছে, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের বিষয়ে তার ধারণায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে এবং আল্লাহর 'কায়েম বিল কিসত' (ন্যায়বিচারক) হওয়ার আকিদা তার মাঝে আর অবশিষ্ট নেই। এরপর, স্বাভাবিকভাবেই অর্থনীতি ও সামাজ ব্যবস্থার পুরো কাঠামো তছনছ হয়ে যায় এবং সভ্যতার কোনো ইটও নিজের জায়গায় বহাল থাকে না।

পণ্যে ভেজাল দেওয়ার বিষয়টিও একই রকম। যদি কোনো ব্যক্তি দুধে পানি, চিনিতে বালি এবং গমে যব মিশিয়ে বিক্রি করে, তবে সে একই অপরাধ করে। কারণ, পুরো ওজন দিয়েও সে ক্রেতাকে তার কেনা জিনিসটি পুরোপুরি দিচ্ছে না। এটা প্রকৃতপক্ষে অন্যের হকে হাত দেওয়া, যার পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাত — উভয় জগতে নিশ্চিতভাবে মন্দ হবে। এজন্য বলা হয়েছে যে, যখন মাপবে, তখন পাত্র পূর্ণ করে দেবে এবং যখন ওজন করবে, তখন সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে, কারণ এটাই উত্তম এবং পরিণামের বিবেচনায়ও এটাই উৎকৃষ্ট।

কুসংস্কার ও ধারণার অনুসরণ

নবম নির্দেশ হচ্ছে, যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, কেউ যেন তার পিছনে না পড়ে। কুরআন সতর্ক করছে যে, এটাকে সামান্য বিষয় মনে করা উচিত নয়, কারণ মানুষের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় ও মস্তিষ্ক — প্রতিটি জিনিসকে একদিন আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। অর্থাৎ কোনো মুসলমানের জন্য এটা জায়েজ নয় যে, সে কুধারণা করবে কিংবা কারো ওপর অপবাদ দেবে, যাচাই ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেবে অথবা নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গুজব ছড়াবে; কিংবা নিজের প্রতিপালকের *যাত* ও *সিফাত* এবং তাঁর হুকুম ও

হেদায়েতের ব্যাপারে অলীক ধারণা, কুসংস্কার এবং অসার অনুমানের ভিত্তিতে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে।

অহংকার ও দম্ভ

দশম নির্দেশ হচ্ছে, খোদাতায়ালার জমিনে কেউ যেন দম্ভভরে না চলে, কারণ এটা অহংকারী ও দাম্ভিকদের চলন। তাই বলা হয়েছে, তুমি জমিনে যতই সজোরে পা ফেলে চলো না কেন, জমিনকে তুমি বিদীর্ণ করতে পারবে না; এবং যতই উদ্ধত হয়ে ও মাথা উঁচু করে চলো না কেন, পাহাড়ের উচ্চতায় তুমি পৌঁছাতে পারবে না।

এ ধরনের চালচলন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের অন্তরের পরিচয় বহন করে। সম্পদ, ক্ষমতা, রূপ-সৌন্দর্য, জ্ঞান, শক্তি এবং এ রকম যত বিষয় মানুষের ভিতরে অহংকার সৃষ্টি করে, সেগুলোর প্রত্যেকটির অহংকার তার চলনে এক বিশেষ ধাঁচে প্রকাশ পায় এবং এই কথার প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায় যে, তার অন্তর দাসত্বের চেতনা থেকে খালি এবং তাতে আল্লাহর মহিমার কোনো ধারণা নেই। যে অন্তরে দাসত্বের চেতনা এবং আল্লাহর মহিমার ধারণা থাকে, তা কেবল তাদের বুকেই স্পন্দিত হয়, যাদের মাঝে বিনয় ও নম্রতার অবস্থা বিরাজ করে। তারা দম্ভ ও ঔদ্ধত্য দেখানোর পরিবর্তে মাথা নত করে চলে।

এখানে এই কথা স্পষ্ট থাকা উচিত যে, মানুষের এই অহংকার ও দম্ভ কেবল তার চলনেই প্রকাশ পায় না; বরং তার কথা, বেশভূষা, পোশাক এবং ওঠা-বসা — প্রতিটি জিনিসেই ফুটে ওঠে। সুতরাং, এমন জিনিসের ব্যবহার নিষিদ্ধ মনে করা উচিত, যা দ্বারা আভিজাত্যের প্রদর্শনী হয় কিংবা যা বড়াই করা, দম্ভোক্তি করা, মিথ্যে অহমিকা দেখানো, অন্যদের ওপর প্রভাব খাটানো কিংবা বখাটেদের স্টাইলে ধমক দেওয়া ব্যক্তিদের বেশভূষার সাথে সংশ্লিষ্ট। এমনকি দাড়ি ও

গোঁফ রাখা এবং পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও কোনো অহংকারী রূপ অবলম্বন করা উচিত নয়।

শুধু এতটুতুই নয়, মানুষের এই মানসিক অবস্থা কিছু বড় বড় গুনাহের কারণও হয়ে ওঠে। সুতরাং বাস্তবতা এই যে, সত্যকে সত্য জেনেও তাকে অস্বীকার করা, বর্ণ ও জাত এবং বংশ-পরিচয়ের বিচারে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা, অন্যদের তুচ্ছ তুচ্ছ জ্ঞান করে তাদের উপহাস করা, তাদের দোষারোপ করা, মন্দ উপাধিতে ডাকা এবং পিছনে তাদের দোষ চর্চা করার মতো গুনাহগুলোর মূল চালিকাশক্তি হলো মানুষের এই আত্মগৌরব, অহংকার ও দম্ভ। আল্লাহতায়ালা এসব কিছু থেকেও অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

তাওরাতের দশ নির্দেশের (Ten Commandments) মতো এগুলো কুরআনের দশ নির্দেশ (*আহকামে আশারা*)। সমগ্র *আখলাকিয়াত* তথা নৈতিকতা এই দশ নির্দেশের-ই শাখা। আল্লাহতায়ালা যেসব গুনাহকে বড় গুনাহ এবং অশ্লীল কাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন, সেগুলো এই নির্দেশের লঙ্ঘনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। কুরআন এই বিষয়ে সুস্পষ্ট যে, এই লঙ্ঘনের শাস্তি মানুষকে কিয়ামতের দিন ভোগ করতে হতে পারে। অতএব, প্রতিটি মুসলমানের জন্য এটা জরুরি যে, এই বিষয়ে সে সতর্ক থাকবে। আর এজন্য এই তিনটি কথা সামনে রাখা উচিত:

এক — এই নির্দেশগুলোর কোনটি যদি অজান্তে লঙ্ঘিত হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তার জন্য পাকড়াও করবেন না। তাঁর কানুন হচ্ছে: অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি এমন কিছু হয়ে যায়, যা আপাতদৃষ্টিতে নিষিদ্ধ কাজ, কিন্তু সেটাতে প্রকৃতপক্ষে সেই নিষিদ্ধ কাজের নিয়ত ছিল না, তবে তিনি সে বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত তালাশ করবেন না।

দুই — কেউ যদি এই নির্দেশগুলোর লঙ্ঘন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে এর প্রতিদান এই যে, আল্লাহতায়ালা তাঁর অসীম রহমতে তার ছোট গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন; অন্যথায় ছোট-বড় সব গুনাহ তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে এবং তাকে সেগুলোর হিসাব দিতে হবে।

তিন — আবেগের বশবর্তী হয়ে কেউ যদি এই নির্দেশগুলোর কোনো একটি লঙ্ঘন করে, তবে তার উচিত তাওবা করে নিজের আচরণ সংশোধন করা। এর জন্য জরুরি যে, যত দ্রুত সম্ভব তওবা করা। আল্লাহতায়ালা কুরআনে স্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর ওপর কেবল তাদেরই তওবা কবুল করার হক প্রতিষ্ঠিত, যারা আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো গুনাহ করে, অতঃপর দ্রুত তওবা করে। যারা সারাজীবন গুনাহে ডুবে থাকে এবং যখন দেখে মৃত্যু মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তওবার ওজিফা পড়তে শুরু করে — আল্লাহর কাছে তাদের তওবা কোনো তওবা নয়। একইভাবে, যারা জেনে-বুঝে সত্যকে অস্বীকার করে, তাদের তওবাও তওবা নয় — যদি তারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত এই অস্বীকারের ওপর অটল থাকে।

তওবা কবুল হওয়া এবং না হওয়ার এই দুটো অবস্থা কুরআন নির্ধারিত করে দিয়েছে। এরপর কেবল একটি অবস্থাই বাকি থাকে যে, কোনো ব্যক্তি গুনাহের পর দ্রুত তওবা করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি, কিন্তু সে এতটুকু দেরিও করেনি যে, মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়েছে। এই অবস্থা সম্পর্কে কুরআন নীরব। এই নীরবতা যেভাবে আশা জাগায়, একইভাবে ভয়ও সৃষ্টি করে; এবং কুরআনের উদ্দেশ্য এটাই মনে হয় যে, বিষয়টি ভয় ও আশার মাঝখানেই থাকুক। এ

ধরনের লোকদের ব্যাপারে *শাফায়াত* তথা সুপারিশের আশা করা যেতে পারে।

জামাল ও কামাল (সৌন্দর্য ও পূর্ণতা)

মানুষের নৈতিক সত্তার সৌন্দর্য যখন স্রষ্টা ও সৃষ্টি — উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছায়, তখন তার থেকে যে গুণাবলি জন্ম নেয় কিংবা কুরআনের দৃষ্টিতে জন্ম নেওয়া উচিত — আল্লাহতায়ালা সেগুলোও এক জায়গাতেই বর্ণনা করেছেন। এগুলো দশটি বিষয় এবং পুরো কুরআনে এগুলোর ব্যাপারে কোনো সংযোজন হয়নি। কুরআনের নিকট ধর্মের *জামাল ও কামাল* (সৌন্দর্য ও পূর্ণতা) এটাই। কুরআন তার অনুসারীদের এই স্তরে পৌঁছাতে এবং এটা অর্জন করতে আহ্বান জানায়।

এই গুণাবলি নিম্নরূপ:

ইসলাম

প্রথম বিষয় — ইসলাম। এখানে যে পদ্ধতিতে এটা ইমানের সাথে এসেছে, সে পদ্ধতিতে এটা দ্বারা ধর্মের বাহ্যিক দিক উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ঐ হেদায়েত, যা মানুষের কথাবার্তা, কাজকর্ম এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং মানুষের জিহ্বা যদি আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশে খোলা ও বন্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তার চোখ যদি তাঁদের ইশারায় দেখতে ও অবনমিত হতে তৈরি থাকে, তার কান যদি তাঁদের নির্দেশনায় শুনতে ও শুনতে অস্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে, তার হাত যদি তাঁদের আদেশে উঠতে ও নত হতে অপেক্ষমান থাকে এবং তার পা যদি তাঁদের ফরমানে চলতে ও থেমে যেতে দ্বিধা না করে, তবে এটাই হলো ইসলাম। কুরআন থেকে জানা যায় যে, এর সর্বোত্তম

নমুনাও নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-গণ। সেজন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টির (*তাসলিম ও রেজা*) এই স্তরে পৌঁছানোর জন্য মানুষ যেন সেই মহাপুরুষদের অনুসরণ করে, যাদেরকে আল্লাহ তাদের জন্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন।

ইমান

দ্বিতীয় বিষয় — ইমান। এটা ধর্মের অভ্যন্তরীণ রূপ এবং এখানে এটা দ্বারা সেই নিশ্চিত বিশ্বাস তথা *ইয়াকিন* উদ্দেশ্য, যা আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর দাবিসমূহ সম্পর্কে তাঁর প্রকৃত *মারেফতের* সাথে অর্জিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে এমনভাবে বিশ্বাস করে যে, আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টির একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিজের অন্তর ও মস্তিষ্ককে তাঁর কাছে সোপর্দ করে, কুরআনের পরিভাষায় সে হচ্ছে: মুমিন। হৃদয়ের পবিত্রতা, বুদ্ধির আলো এবং সংকল্পের পরিচ্ছন্নতা এটা থেকেই অর্জিত হয়। এই ইমান-ই জ্ঞান ও কর্ম — উভয়কে একসাথে প্রভাবিত করে এবং মানুষের পুরো সত্তার ওপর ছায়া বিস্তার করে। অতঃপর আল্লাহর স্মরণ, তাঁর আয়াতসমূহের তিলাওয়াত এবং নিজের ভিতরে ও বাইরের জগতে এসব আয়াতের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে ইমানের বৃদ্ধি ঘটে। কুরআনে এর দাবি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার কোনো জিনিসই ইমানের ধারকদের কাছে আল্লাহ ও রাসুলের চেয়ে বেশি প্রিয় হওয়া উচিত নয়।

কুনুত

তৃতীয় বিষয় — কুনুত। এটা সেই মানসিক অবস্থা, যা মানুষকে পূর্ণ *ইখলাস* এবং একাগ্রতার সাথে সর্বদা নিজের প্রতিপালকের আনুগত্যে অবিচল রাখে। মুমিন বান্দার অস্তিত্বের অন্তঃস্থলে বান্দা ও মাবুদের সম্পর্কের সবচেয়ে উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ এটাই। সুতরাং 'কানিতিন' হলো সেই সব লোক, যারা সর্বদা দাসত্বের মধ্যে থাকে।

দুঃখ, সুখ, উত্তেজনা, আবেগ এবং আনন্দ ও বেদনার কোনো অবস্থাতেই নিজের স্রষ্টার অবাধ্য হয় না। কামনার জোয়ার, আবেগের আক্রমণ এবং লালসার ভিড়ও যেন তাদের আল্লাহর সামনে কখনো বেয়াদব হতে না দেয়। তাদের অন্তর হবে আল্লাহর আরশ এবং তাঁর শরিয়তকে তারা হাজির অবস্থায় দেওয়া নির্দেশ মনে করবে, যা লঙ্ঘন করার কল্পনাও দরবারে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো ব্যক্তি করতে পারে না। একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এটা ঠিক সেই অবস্থা — যা এই পুরো জগৎ এবং এর সমস্ত সৃষ্টি তাদের নিজেদের অস্তিত্ব ও অবস্থা দিয়ে প্রকাশ করছে।

সিদক

চতুর্থ বিষয় — *সিদক*। এটা কথা, কাজ এবং সংকল্প — এই তিনের মিল ও দৃঢ়তার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। মানুষের মুখ থেকে যেন সত্যের পরিপন্থী কোনো শব্দ না বের হয়, তার কথা ও কাজে কোনো বৈপরীত্য না থাকে এবং সে নিজের প্রতিটি কথা রক্ষা করে — তবে এটাই হচ্ছে: কথা ও কাজের সত্যবাদিতা। কিন্তু এর সাথে নিয়ত ও সংকল্পের সত্যবাদিতাও অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। কুরআন এর বিপরীত চরিত্রকে *নিফাক* এবং এটাকে *ইখলাস* হিসেবে অভিহিত করেছে। অতঃপর বিভিন্ন জায়গায় স্পষ্ট করেছে যে, আল্লাহর কাছে কর্মের আসল রূপ সেটাই, যা হৃদয়ের কারখানায় তৈরি হয়। অতএব *সিদক*-এর পূর্ণতার স্তর অর্জিত হয় কথা, কাজ ও সংকল্পের এই সামঞ্জস্য থেকে।

সবর

পঞ্চম বিষয় — *সবর*। এটা প্রাথমিক অর্থে নফস বা প্রবৃত্তিকে অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আসে। এরপর এর

মাধ্যমে বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বীরত্ব, দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে নিজের অবস্থানে অটল থাকার অর্থ এতে সৃষ্টি হয়েছে। এটা কোনো অক্ষমতা বা হীনম্মন্যতার বিষয় নয়, যা নিরুপায় অবস্থায় বাধ্য হয়ে গ্রহণ করা হয়; বরং এটা দৃঢ় সংকল্প ও সাহসের উৎস এবং গোটা জীবনাচার ও চরিত্রের *জামাল ও কামাল* (সৌন্দর্য ও পূর্ণতা)। *সবর* থেকেই মানুষের মধ্যে এই মানসিক শক্তি সৃষ্টি হয় যে, জীবনের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাগুলোর ব্যাপারে অভিযোগ বা আর্তনাদের পরিবর্তে সে সেগুলোকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করে সেগুলোকে স্বাগত জানায়; কর্মের ফল পেতে দেরি হলে বিচলিত হয় না; অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা থেকে বেঁচে থাকে; মন্দ আচরণকারীদের বিরুদ্ধেও নিজের অন্তরে প্রতিশোধের কোনো আবেগ সৃষ্টি হতে দেয় না; হকের সপক্ষে দাঁড়ানোর সুযোগ আসলে মৃত্যুকে সামনে দেখেও অবিচল থাকে; দুঃখ ও সুখের প্রতি অবস্থায় আত্মসংবরণ করে; এবং যে বিষয়কে কর্তব্য ও আবশ্যক মনে করে, সারা জীবন তার ওপর অটল থাকে।

মানুষের চরিত্রের এই দিকটি দিয়েই আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সেই সম্পর্ক তৈরি হয়, যাকে *তাওয়াক্কুল* (নির্ভরতা) বলে। অর্থাৎ সব অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করা। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' হলো এই আত্মসমর্পণ ও নিজেকে সোপর্দ করার বাণী। কুরআনের বর্ণনা হচ্ছে, ঐসব লোকের জন্য আল্লাহতায়ালার বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ রয়েছে, যারা এই বাণীর ওপর অটল থাকে এবং এভাবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

খুশু

ষষ্ঠ বিষয় — *খুশু*। আল্লাহতায়ালার মাহাত্ম্য এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের সঠিক ধারণা থেকে যে নম্রতা, দৈন্য ও বিনয় মানুষের ভিতরে

সৃষ্টি হয়, কুরআন তাকে 'খুশু' হিসেবে অভিহিত করে। এটা হৃদয়ের একটি অবস্থা, যা তাকে আল্লাহর সামনে নত করে এবং অন্য মানুষের জন্যেও তার অন্তরে মায়া ও মমতার আবেগ সৃষ্টি করে।

প্রথম অবস্থায়, এর সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে নামাজে — বিশেষ করে রাতের নামাজে; যখন মুমিন বান্দা দুনিয়ার সব কিছু থেকে আলাদা হয়ে একাকী নিজের প্রতিপালকের সাথে চুপিচুপি কথা বলে এবং নিজের নিঃসঙ্গতাকে আল্লাহর জিকির ও শুকরিয়ায় পূর্ণ করে দেয়।

দ্বিতীয় অবস্থায়, এই অবস্থা মুমিন বান্দার পুরো ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব ফেলে এবং তাকে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য আপাদমস্তক স্নেহশীল, নিজের বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ও সাক্ষাৎকারীদের জন্য আগাগোড়া রহমত এবং নিজের সমাজের জন্য হেদায়েতের এক উৎস বানিয়ে দেয়। এ ধরনের সহনশীল ও দয়ালু মানুষদের মাধ্যমেই সেই সভ্যতা অস্তিত্বে আসে, যা জমিনে আল্লাহর জান্নাত এবং প্রতিটি সুস্থ স্বভাবের মানুষের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

সদকা

সপ্তম বিষয় — *সদকা*। আল্লাহর পথে ব্যয়ের একটি স্তর হচ্ছে, মানুষ নিজের সম্পদ থেকে ফরজ যাকাত আদায় করবে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, নিজের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু আছে, সেটাকে সমাজের হক মনে করবে এবং যখন কোনো দাবি সামনে আসবে, তখন তা উদারচিত্তে পূরণ করবে। তৃতীয় স্তর হচ্ছে, নিজের আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে এবং নিজের প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করেও অন্যের প্রয়োজন পূরণ করা। *সদকা* প্রদানকারীদের বর্ণনায় এই সবগুলো অবস্থাই শামিল হতে পারে, কিন্তু গুণাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে

যখনই এই শব্দ ব্যবহৃত হবে, তখন সেটা দ্বারা মূলত সদকার পূর্ণতার স্তরের দিকেই ইশারা করা হয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির মধ্যে এই গুণ থাকার অর্থ — তিনি একজন উদার ও বড় মনের মানুষ, যিনি আল্লাহর পথে খরচ করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া হতে দেন না। বান্দাদের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে এটা সেই *খুশু*-র-ই বহিঃপ্রকাশ, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। নামাজ ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের কথা কুরআনে এই কারণেই পাশাপাশি আসে।

রোজা

অষ্টম বিষয় — রোজা। এটা আত্মসংবরণ এবং *সবর* অর্জনের বিশেষ ইবাদত। কুরআনে এর উদ্দেশ্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা *তাকওয়া* অর্জিত হয়। সুতরাং গুণাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে যখন রোজাদারদের কথা আসবে, তখন এর দ্বারা সেসব লোক উদ্দেশ্য হবে, যারা *তাকওয়া* অর্জনের এতই আগ্রহী যে, এর জন্য তারা অধিকাংশ সময় রোজা রাখে। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, তারা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকে, অশ্লীলতা পরিহার করে এবং নিজেদের জীবনে সর্বোচ্চ নৈতিকতার সর্বোত্তম নমুনা হয়।

হিফজে ফুরুজ

নবম বিষয় — *হিফজে ফুরুজ*। অর্থাৎ যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা আত্মসংবরণ ও *তাকওয়ার* ফল। নগ্নতা, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা পরিহারকারীদের জন্য এই পরিভাষা কুরআনের বহু স্থানে এসেছে। এর অর্থ, তারা নিজেদের সতীত্ব ও চারিত্রিক পবিত্রতা চূড়ান্ত পর্যায়ে রক্ষা করে। সেজন্য আল্লাহ যেখানে অনুমতি দিয়েছেন, তা ছাড়া নির্জনে বা প্রকাশ্যে তারা নিজেদের *সতর* (আবরণ) কারো সামনে খোলে না এবং এমন পোশাক কখনো পরিধান করে না, যা এমন

অঙ্গগুলোকে প্রকাশ করে — যেগুলোর মধ্যে কোনো দিক থেকে যৌন আকর্ষণ থাকে। অশ্লীলতা পরিহারের এই স্তর থেকেই সেই সংস্কৃতি জন্ম নেয়, যেখানে *হায়া* বা লজ্জা শাসন করে এবং নারী ও পুরুষ উভয়ই নিজের শরীরকে যতটা সম্ভব খোলামেলা রাখার পরিবর্তে যতটা সম্ভব ঢেকে রাখতে উদগ্রীব থাকে।

জিকরে কাসির

দশম বিষয় — *জিকরে কাসির*। অর্থাৎ আল্লাহকে খুব বেশি স্মরণ করা। মুমিন বান্দার অন্তরে যখন নিজের প্রতিপালকের খেয়াল পুরোপুরি গেঁথে যায়, তখন সে নির্দিষ্ট সময়ে ইবাদত করাকেই যথেষ্ট মনে করে না; বরং সবসময় নিজের জিহ্বাকে আল্লাহর জিকিরে চালু রাখে। আল্লাহতায়ালার নিদর্শনসমূহের মধ্যে কোনো নিদর্শন দেখে সে 'সুবহানাল্লাহ' (سُبْحَانَ اللهِ) বলে। কোনো কাজ সে 'বিসমিল্লাহ' (بِسْمِ اللهِ) শুরু দিয়ে করে। কোনো নিয়ামত পেলে সে 'আলহামদুলিল্লাহ' (اَلْحَمْدُ لِلّٰه) বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। 'ইনশাআল্লাহ' (إِنْ شَاءَ اللهِ) এবং 'মাশাআল্লাহ' (مَا شَاءَ اللهِ) ছাড়া নিজের কোনো ইচ্ছা বা সংকল্প সে ব্যক্ত করে না, নিজের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়। কোনো বিপদ এলে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী হয়। প্রতিটি সমস্যায় তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। ঘুমানোর সময় তাঁকে স্মরণ করে ঘুমায় এবং জেগে ওঠার সময় তাঁর নাম নিয়েই ওঠে। মোটকথা প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি বিষয়ে তার মুখে আল্লাহরই জিকির থাকে। শুধু তাই নয়, নামাজ পড়ে তো সে আল্লাহকে স্মরণ করে; রোজা রাখে তো আল্লাহকে স্মরণ করে; কুরআন তিলাওয়াত করে তো আল্লাহকে স্মরণ করে; দান-খয়রাত করে তো আল্লাহকে স্মরণ করে; মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকে তো আল্লাহকে স্মরণ করে; কখনো মন্দ কাজ করলে

আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

এই জিকিরের একটি রূপ হচ্ছে: *ফিকির* (চিন্তা)। খোদাতায়ালার এই দুনিয়ার দিকে তাকালে দেখা যায় — এতে রয়েছে হাজারো সৃষ্টি, তাদের নানা রঙ-বর্ণ এবং বিচিত্রতা; মানুষের বুদ্ধি ও তার কারিশমা; সমুদ্রের গর্জন, নদীর প্রবাহ, দোদুল্যমান সবুজ শ্যামলিমা এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি; দিন-রাত্রির আবর্তন; বাতাস ও মেঘমালার ক্রিয়াকলাপ; আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তাদের বিস্ময়কর গঠন; তাদের উপকারিতা ও কল্যাণ; তাদের উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা; তারপর নিজের ভিতরে ও বাইরের জগতে খোদার সেই সব নিদর্শন, যা প্রতি মুহূর্তে নতুন মহিমায় প্রকাশিত হয়। মুমিন বান্দা আল্লাহর এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করে, তখন এগুলো তার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আল্লাহর স্মরণে ভরে দেয়। সে চিৎকার করে ওঠে — *হে প্রতিপালক, এই কারখানা আপনি অনর্থক তৈরি করেননি। আপনার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মহিমার পরিপন্থী যে, আপনি কোনো উদ্দেশ্যহীন কাজ করবেন। আমি জানি, এই রঙ ও সুবাসের জগতের সমাপ্তি অবশ্যই একদিন কর্মফল দিবসের মাধ্যমে হবে, যেখানে তারা শাস্তি ও লাঞ্ছনার মুখোমুখি হবে, যারা আপনার এই পৃথিবীকে কোনো খেলোয়াড়ের খেলা মনে করে জীবন অতিবাহিত করে। তাদের পরিণাম থেকে আমি আপনার পানাহ চাই*।

দ্বিতীয় অংশ : আল-কিতাব

[১. ইবাদতের বিধি-বিধান, ২. সামাজিক বিধি-বিধান,
৩. রাজনীতির বিধি-বিধান, ৪. অর্থনীতির বিধি-বিধান,
৫. দাওয়াতের বিধি-বিধান, ৬. জিহাদের বিধি-বিধান,
৭. হুদুদ ও তাজিরাত (দণ্ডবিধি), ৮. খাদ্য ও পানীয়,
৯. রসম-রেওয়াজ ও আদব-কায়দা,
১০. কসম এবং কসমের কাফফারা]

১. ইবাদতের বিধি-বিধান

ধর্মের উদ্দেশ্য *তাজকিয়া*। *তাজকিয়ার* পূর্ণতার চরম শিখরে পৌঁছানোর মাধ্যম হলো আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার *আবদ* ও *মাবুদের* সম্পর্ক সঠিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই সম্পর্ক যত মজবুত হয়, মানুষ নিজের ইলম ও আমলের পবিত্রতায় ততই উন্নতি করে। মহব্বত, ভয়, *ইখলাস* ও বিশস্ততা এবং আল্লাহতায়ালার অপরিসীম নিয়ামত ও অগণিত ইহসানের জন্য অনুভব ও স্বীকৃতির আবেগ — এগুলো এই সম্পর্কের *বাতিনি* বা অভ্যন্তরীণ বহিঃপ্রকাশ। মানুষের দিন ও রাতে এটার প্রকাশ সাধারণত তিনটি রূপে হয়: উপাসনা, আনুগত্য এবং ধর্মীয় আত্মমর্যাদা ও সহযোগিতা। নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-দের ধর্মে ইবাদতসমূহ এই সম্পর্কের কথা স্মরণ করানোর জন্যই নির্ধারিত হয়েছে। নামাজ ও যাকাত হলো উপাসনা। কুরবানি ও উমরার হাকিকতও এটাই। রোজা ও *ইতিকাফ* হলো আনুগত্য; অন্যদিকে হজ্জ হচ্ছে আল্লাহতায়ালার জন্য ধর্মীয় আত্মমর্যাদা ও সহযোগিতার প্রতীকী প্রকাশ।

নামাজ

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাজ। ধর্মের হাকিকত নিয়ে যদি চিন্তা করেন, তবে তা মাবুদের *মারেফত* এবং তাঁর

দরবারে ভয় ও মহব্বতের আবেগের সাথে বিনয় ও দাসত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। এই হাকিকতের সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রকাশ হলো উপাসনা। *তাসবিহ* ও *তাহমিদ*, দোয়া ও মোনাজাত এবং রুকু ও সেজদা এই উপাসনার ব্যবহারিক রূপ। নামাজ এটাই এবং এটা অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে এই সবগুলো বিষয়কে নিজের মধ্যে ধারণ করে।

ধর্মে এই ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইমানি বিষয়ে তাওহিদের যে মর্যাদা, আমলের ক্ষেত্রে নামাজের মর্যাদা ঠিক তেমন। আল্লাহর স্মরণকে কায়েম রাখার জন্য নামাজ ফরজ করা হয়েছে। কুরআন থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের স্মরণ থেকে খোদার যে *মারেফত* অর্জিত হয় এবং সেটা থেকে আল্লাহতায়ালার জন্য মহব্বত ও শুকরিয়ার যে আবেগ মানুষের ভিতরে সৃষ্টি হয় বা হওয়া উচিত, তার প্রথম ফল হচ্ছে: এই নামাজ। এটা ইসলামের স্তম্ভ। দুনিয়া ও আখিরাতে একজন মানুষ যেসব শর্তের ভিত্তিতে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে, তার একটি শর্ত হচ্ছে নামাজ। নামাজ ধর্মে অটল থাকার মাধ্যম; নামাজ বিপদ দূর করে, গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়; এটা সত্যের দাওয়াতের পরিচয়, সত্যের পথে অবিচল থাকার ভিত্তি, মহাবিশ্বের *ফিতরাত* এবং প্রকৃত জীবন। খোদাতায়ালার *মারেফত*, তাঁর জিকির ও ফিকির (চিন্তা) এবং তাঁর নৈকট্যের অনুভূতি যখন পূর্ণতার চরম শিখরে পৌঁছায়, তখন তা নামাজে রূপান্তরিত হয়। দুনিয়ার সকল খোদায়ি *মারেফত* অর্জনকারীদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আসল জীবন হলো অন্তরের জীবন, আর অন্তরের জীবন হলো এই *মারেফত*, জিকির ও *ফিকির* এবং আল্লাহর নৈকট্য। এই জীবন মানুষ কেবল নামাজ থেকে লাভ করে এবং নামাজের মাধ্যমেই তা টিকে থাকে।

নামাজের ইতিহাস

নামাজের ইতিহাস ঠিক ততটাই প্রাচীন, যতটা প্রাচীন ধর্ম নিজেই। নামাজের ধারণা সকল ধর্মে বিদ্যমান ছিল এবং এর রীতিনীতি ও আদায়ের সময়কালও কম-বেশি নির্ধারিত ছিল। হিন্দুদের ভজন, পার্সিদের জমজমা, খ্রিষ্টানদের প্রার্থনা এবং ইহুদিদের *মাযামির* (স্তবগান) — সবই এটারই স্মৃতিচিহ্ন। কুরআন জানাচ্ছে, আল্লাহর সকল নবী নামাজের শিক্ষা দিয়েছেন। নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর নবুয়ত যে ইব্রাহিমি ধর্মের সংস্কারের জন্য হয়েছিল, তাতেও এর মর্যাদা ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য। কুরআন যখন মানুষকে নামাজের নির্দেশ দিল, তখন এটা তাদের জন্য কোনো অপরিচিত বিষয় ছিল না। তারা এর আদব, শর্তাবলি এবং আমল ও *জিকির-আজকার* সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিল। ফলে কুরআন এটার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি। ইব্রাহিমি ধর্মের একটি ঐতিহ্য হিসেবে নামাজ যেভাবে আদায় করা হতো, নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) কুরআনের নির্দেশে কিছু পরিবর্তনের সাথে এটাকে তার অনুসারীদের জন্য জারি করেন এবং বংশপরম্পরায় তারা ঠিক সেভাবেই নামাজ আদায় করে আসছে।

নামাজের শর্তাবলি

নামাজের জন্য যেসব বিষয় নিশ্চিত করা জরুরি, তা হলো:

- নামাজ আদায়কারী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে না।
- তিনি যদি নারী হন, তবে *হায়েজ* (মাসিক) ও *নেফাস* (সন্তান জন্মদান পরবর্তী রক্তস্রাব) অবস্থায় থাকবেন না।

- তিনি ওজু অবস্থায় থাকবেন এবং *হায়েজ* ও *নেফাস* অথবা *জানাবাতের* (স্ত্রী-সহবাস বা বীর্যপাতের কারণে সৃষ্ট অপবিত্রতা) পরে গোসল করে নেবেন।
- সফর, অসুস্থতা অথবা পানির অপ্রাপ্যতার ক্ষেত্রে এই দুই পদ্ধতিই কঠিন হয়ে পড়লে তিনি তায়াম্মুম (মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন) করবেন।
- কিবলার দিকে মুখ করে নামাজের জন্য দাঁড়াবেন।

ওজু করার নিয়ম হলো: প্রথমে মুখ ধোয়া হবে, তারপর কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া হবে, তারপর পুরো মাথা মাসেহ করা হবে এবং এরপর পা ধুয়ে নেওয়া হবে।

ওজু যদি একবার করা হয়, তবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বহাল থাকে, যতক্ষণ না কোনো ওজু ভঙ্গকারী কোনো অবস্থা মানুষের সামনে আসে। অতএব, ওজুর এই হেদায়েত ঐ অবস্থার জন্য, যখন ওজু থাকে না। কিন্তু যদি কেউ মনের প্রফুল্লতার জন্য নতুন করে ওজু করে, তবে সেটা ভিন্ন কথা।

ওজু ভঙ্গের কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. প্রস্রাব করা

২. পায়খানা করা

৩. বায়ু নির্গত হওয়া, চাই তা শব্দের সাথে হোক বা নিঃশব্দে

৪. *মযি* (যৌন উত্তেজনায় নির্গত পাতলা তরল) বা *ওদি* (প্রস্রাবের আগে-পরে আসা সাদা আঠালো তরল) নির্গত হওয়া।

সফর, অসুস্থতা বা পানির অপ্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ওজু ও গোসল — উভয়টিই কঠিন হয়ে পড়লে আল্লাহতায়ালা অনুমতি দিয়েছেন যে, ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারে। এর নিয়ম হলো: কোনো পাকপবিত্র জায়গা দেখে সেটা দিয়ে চেহারা ও হাত মাসেহ করা। এটা সব ধরনের অপবিত্রতার জন্য যথেষ্ট। ওজু ভঙ্গকারী কিছু ঘটে গেলে তারপরও এটা করা যেতে পারে এবং সহবাসের পর *জানাবাতের* গোসলের বদলেও এটা করা যেতে পারে। অধিকন্তু, অসুস্থতা ও সফরের অবস্থায় পানি থাকা সত্ত্বেও মানুষ তায়াম্মুম করতে পারে।

তায়াম্মুম দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে কোনো পবিত্রতা অর্জিত হয় না, কিন্তু যদি একটু চিন্তা করেন, তবে আসল পবিত্রতার পদ্ধতিকে মনের স্মৃতিতে বজায় রাখার দিক থেকে তায়াম্মুমের বড় গুরুত্ব রয়েছে। শরিয়তে সাধারণত এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয় যে, যখন আসল সুরতে কোনো হুকুমের ওপর আমল করা সম্ভব হয় না বা খুব কঠিন হয়ে পড়ে, তখন সাদৃশ্যপূর্ণ রূপে তার স্মৃতি অবশিষ্ট রাখা হয়। এর উপকার হচ্ছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া মাত্রই মানুষের মেজাজ বা স্বভাব আসল রূপের দিকে ফিরে যেতে প্রস্তুত হয়।

নামাজের আমল বা কাজ

নামাজের জন্য যে আমলসমূহ নির্ধারিত করা হয়েছে, সেগুলো হলো:

- নামাজ শুরু করার সময় ‘রফউল ইয়াদাইন’ করা, অর্থাৎ দুই হাত ওপরের দিকে তোলা।
- *কিয়াম* করা (দাঁড়ানো)।
- এরপর রুকু করা।

- রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো (*কওমা*)।
- এরপর পরপর দুটি সেজদা করা।
- প্রতি দুই রাকাত পর এবং শেষ রাকাতে নামাজি ব্যক্তি 'কাদা' (দুই পা ভাঁজ করে বসা) পদ্ধতিতে বসবেন।
- নামাজ শেষ করার ইচ্ছা থাকলে 'কাদা' পদ্ধতিতে বসা অবস্থায় মুখ ফিরিয়ে (সালামের মাধ্যমে) নামাজ শেষ করা।

নামাজের জিকির-আজকার

নামাজের জিকিরসমূহ নিম্নরূপ:

- নামাজ শুরুর সময় 'আল্লাহু আকবার' (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলা।
- কিয়ামের (দাঁড়ানো) অবস্থায় সুরা ফাতিহা পাঠ করা এবং এরপর নিজের সুবিধা অনুযায়ী কুরআনের অন্য কোনো অংশ তিলাওয়াত করা।
- রুকুতে যাওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলা।
- রুকু থেকে ওঠার সময় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) বলা।
- সেজদায় যাওয়া এবং সেজদা থেকে ওঠার সময়ও 'আল্লাহু আকবার' (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলা।
- বসা অবস্থা থেকে পুনরায় দাঁড়ানোর সময় 'আল্লাহু আকবার' (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলা।
- নামাজ শেষ করার জন্য 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' (اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ) বলা।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ সবচেয়ে বড়), سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (আল্লাহ তার কথা শুনেছেন, যে তাঁর হামদ করেছে) এবং اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (আপনার ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) — ইমাম সবসময় এগুলো উচ্চস্বরে বলবে। মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকাতে এবং ফজর, জুমআ ও দুই ঈদের নামাজে তিলাওয়াতও উচ্চস্বরে হবে। মাগরিবের তৃতীয় এবং এশার তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে এটা সবসময় নিচুস্বরে হবে। জোহর ও আসরের নামাজে একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। এই নামাজগুলোর চার রাকাতেই তিলাওয়াত নিচুস্বরে হবে।

নামাজের জন্য শরিয়তের নির্ধারিত জিকিরসমূহ এগুলোই এবং এগুলোর ভাষা আরবি। এগুলো ছাড়াও নামাজ আদায়কারী যে ভাষায় চায় *তাসবিহ* ও *তাহমিদ* এবং দোয়া ও মোনাজাত জাতীয় অন্য কোনো জিকির নিজের নামাজে করতে পারেন।

নামাজের ওয়াক্ত বা সময়

মুসলমানদের জন্য দিন-রাত মিলিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে। এই ওয়াক্তসমূহ নিম্নরূপ:

ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব এবং এশা।

- ফজর: যখন ভোরের সাদা আভা কালো রেখা থেকে আলাদা হয়ে যায়।
- জোহর: সূর্য মধ্যাকাশ থেকে ঢলে পড়ার সময়।
- আসর: যখন সূর্য চোখের দৃষ্টিসীমা থেকে কিছুটা নিচে নেমে আসে।
- মাগরিব: সূর্যাস্তের সময়।
- এশা: আকাশের লাল আভা শেষ হয়ে যাওয়ার সময়।

ফজরের সময় সূর্যোদয় পর্যন্ত, জোহরের সময় আসর পর্যন্ত, আসরের সময় মাগরিব পর্যন্ত, মাগরিবের সময় এশা পর্যন্ত এবং এশার সময় মধ্যরাত পর্যন্ত থাকে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় যেহেতু (অন্য ধর্মে) সূর্যের পূজা করা হতো, তাই এই দুই সময়ে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-দের ধর্মে নামাজের সময় সব সময় এমনই ছিল।

নামাজের রাকাত সংখ্যা

নামাজের জন্য যে রাকাতসমূহ নির্ধারিত, সেগুলো নিম্নরূপ:

- ফজর : ২ রাকাত।
- জোহর : ৪ রাকাত।
- আসর : ৪ রাকাত।
- মাগরিব : ৩ রাকাত।
- এশা : ৪ রাকাত।

নামাজের ফরজ রাকাত এগুলোই, যা ছেড়ে দিলে কিয়ামতে জবাবদিহি করতে হবে। তাই যেসব অবস্থায় নামাজ *কসর* (সংক্ষেপ) করার অনুমতি আছে, তা ছাড়া এই নামাজগুলো অবশ্যই পড়তে হবে। এগুলো বাদে বাকি সব নামাজই নফল, যা পড়লে সওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু না পড়লে আল্লাহতালার পক্ষ থেকে কোনো শাস্তির ভয় নেই।

নামাজের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়

কোনো বিপদ, দুশ্চিন্তা বা চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সময় যদি নামাজের ওয়াক্ত হয়, তবে আল্লাহতায়ালা অনুমতি দিয়েছেন যে, হেঁটে বা সওয়ারিতে (বাহনে) থাকা অবস্থায় যেভাবে সম্ভব নামাজ পড়া

যাবে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই জামাতের আয়োজন থাকবে না, কিবলার দিকে মুখ করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নামাজের সাধারণ নিয়মগুলোও সব ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পালন করা সম্ভব হবে না।

সফর বা ভ্রমণের সময় এমন পরিস্থিতি দেখা দিলে কুরআন আরও জানিয়েছে যে, মানুষ নামাজ কমিয়ে (সংক্ষিপ্ত করে) পড়তে পারে। পারিভাষিকভাবে এটাকে *কসর* বলা হয়। রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর জন্য এই সুন্নাত কায়েম করেছেন যে, কেবল চার রাকাতের নামাজগুলো দুই রাকাত করে পড়া হবে। দুই এবং তিন রাকাতের নামাজে কোনো কমতি হবে না। অতএব ফজর এবং মাগরিবের নামাজ এমন অবস্থাতেও পূর্ণ পড়া হবে। কারণ, ফজর আগে থেকেই দুই রাকাত এবং মাগরিব হলো দিনের *বিতর* তথা বেজোড়, তাই এই নামাজগুলোর ধরনে কোনো পরিবর্তন হবে না।

নামাজের রাকাত সংখ্যায় এই ছাড় দেওয়ার বিষয় থেকে সময়ের ক্ষেত্রেও ছাড় পাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ এ ধরনের সফরে জোহর-আসর এবং মাগরিব-এশা একত্রে (জমা করে) পড়া যেতে পারে।

নামাজের জামাত

নামাজ যদিও একা-একা পড়া যায়, তবে উত্তম হলো জামাতের সাথে এবং সম্ভব হলে কোনো ইবাদতখানা তথা মসজিদে গিয়ে তা আদায় করা। এই উদ্দেশ্যে নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) ইয়াসরিব শহর বা মদিনাতে পৌঁছে সবার আগে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এখান থেকেই মুসলমানদের প্রতিটি পাড়া ও মহল্লায় মসজিদ নির্মাণের ঐতিহ্য শুরু হয়। মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়ার অনেক ফজিলত রয়েছে। নারীরা অবশ্য এর থেকে ব্যতিক্রম। তবে

কোনো মুসলমান পুরুষের উচিত নয় কোনো কারণ ছাড়া জামাত ত্যাগ করা।

জামাত কায়েম করার নিয়ম

১. নামাজের আগে আজান দেওয়া হবে, যাতে মানুষ আজান শুনে জামাতে শামিল হতে পারে। রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) আজানের জন্য যে বাক্যগুলো নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো হলো:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ؛ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ؛ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ؛ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ؛ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؛ اَللّٰهُ اَكْبَرُ؛ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

আল্লাহু আকবার; আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ; হাইয়্যা আলাস সালাহ; হাইয়্যা আলাল ফালাহ; আল্লাহু আকবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

"আল্লাহ সবচেয়ে বড়; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল; নামাজের দিকে আসো; কল্যাণের দিকে আসো; আল্লাহ সবচেয়ে বড়; আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"

২. *মুক্তাদি* (ইমামের অনুসারী) একজন হলে তিনি ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবেন। আর একাধিক হলে ইমাম মাঝখানে থাকবেন এবং *মুক্তাদিরা* তার পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন।

৩. নামাজ শুরু করার জন্য ইকামত বলা হবে। ইকামতে আজানের শব্দগুলোই পুনরায় বলা হবে। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (*হাইয়্যা আলাল ফালাহ*)-এর পর ইকামত প্রদানকারী قَدْ

قَامَتِ الصَّلٰوةُ (*কাদ কামাতিস সালাহ* — নামাজ দাঁড়িয়ে গেছে) কথাটি বলবেন।

৪. আজানের বাক্যগুলো প্রয়োজনে একের অধিকবার বলা যেতে পারে।

৫. ইকামতের বাক্যগুলোও প্রয়োজনে একইভাবে পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

নামাজে ভুল

নামাজের জন্য যে সমস্ত আমল ও জিকির নির্ধারিত, সেগুলোর মধ্যে কোনো ভুল হয়ে গেলে অথবা সন্দেহ হয় যে ভুল হয়েছে, তবে এই সুন্নাত নির্ধারিত রয়েছে যে, ভুলের প্রতিকার করা সম্ভব হলে সেটা করার পর, আর সম্ভব না হলে প্রতিকার ছাড়াই নামাজের শেষে দুটো অতিরিক্ত সেজদা করবে।

জুমার নামাজ

জুমার দিনে মুসলমানদের ওপর এটা আবশ্যক করা হয়েছে যে, তারা জোহরের নামাজের পরিবর্তে এই দিনের জন্য নির্ধারিত একটি বিশেষ সম্মিলিত বা জামাতবদ্ধ নামাজের আয়োজন করবে। এই নামাজের পদ্ধতি হলো:

- এই নামাজ দুই রাকাত পড়া হবে।
- জোহরের নামাজের বিপরীতে এই নামাজের উভয় রাকাতেই তিলাওয়াত উচ্চস্বরে হবে।
- নামাজের জন্য *তাকবির* (ইকামত) বলা হবে।

- নামাজের আগে ইমাম উপস্থিত মুসল্লিদের উপদেশ ও নসিহতের জন্য দুটো খুতবা দেবেন। এই খুতবা দাঁড়িয়ে দিতে হবে। প্রথম খুতবার পর এবং দ্বিতীয় খুতবা শুরু করার আগে ইমাম কয়েক মুহূর্তের জন্য বসবেন।

- নামাজের আজান তখন দেওয়া হবে, যখন ইমাম খুতবা দেওয়ার জায়গায় চলে আসবেন।

- আজান হওয়ার সাথে সাথেই সমস্ত মুসলমান পুরুষের জন্য জরুরি যে, যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত ওজর না থাকে, তবে তারা নিজেদের কাজকর্ম ছেড়ে নামাজের জন্য উপস্থিত হবে।

- নামাজের খুতবা এবং এর ইমামতি মুসলমানদের *আরবাব-এ-হাল ও আকদ* (রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল বা শাসনকর্তা) করবেন। এই নামাজ কেবল সেই সব স্থানেই আদায় করা হবে, যা তাদের পক্ষ থেকে জামাতের জন্য নির্ধারণ করা হবে এবং যেখানে তারা নিজে অথবা তাদের কোনো প্রতিনিধি ইমামতির জন্য উপস্থিত থাকবেন।

দুই ঈদের নামাজ

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনেও মুসলমানদের ওপর এটা আবশ্যক যে, সূর্যোদয়ের পর এবং দ্বিপ্রহরের আগে তারা জুমার মতোই একটি সম্মিলিত নামাজের আয়োজন করবে। এর পদ্ধতি নিম্নরূপ:

- এই নামাজ দুই রাকাত পড়া হবে।

- উভয় রাকাতেই তিলাওয়াত উচ্চস্বরে হবে।

- কিয়ামের (দাঁড়ানো) অবস্থায় নামাজিরা কয়েকটি অতিরিক্ত তাকবির বলবেন।

- এই নামাজের জন্য কোনো আজান বা *তাকবির* (ইকামত) হবে না।
- নামাজের পর ইমাম উপস্থিতদের নসিহতের জন্য দুটো খুতবা দেবেন। এই খুতবা দাঁড়িয়ে দিতে হবে। প্রথম খুতবার পর এবং দ্বিতীয় খুতবা শুরুর আগে ইমাম কয়েক মুহূর্ত বসবেন।
- এই নামাজের খুতবা এবং ইমামতিও জুমার নামাজের মতো মুসলমানদের *আরবাব-এ-হাল ও আকদ* (রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল বা শাসনকর্তা) করবেন এবং এই নামাজ সেসব স্থানেই আদায় করা হবে, যা তাদের পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং যেখানে তারা নিজে বা তাদের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

জানাজার নামাজ

মৃত ব্যক্তির জন্য জানাজার নামাজও নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-দের ধর্মে আবশ্যক করা হয়েছে।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও দাফন-কাফনের প্রস্তুতির পর এই নামাজ যেভাবে আদায় করা হবে, তা হলো:

- মৃত ব্যক্তিকে নিজের এবং কিবলার মাঝখানে রেখে মুক্তাদিরা ইমামের পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন।
- রফউল ইয়াদাইন বা দুই হাত তুলে 'আল্লাহু আকবার' (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলে নামাজ শুরু করা হবে।
- ঈদের নামাজের মতো এই নামাজেও কয়েকটি অতিরিক্ত তাকবির বলা হবে।
- কিয়াম বা দাঁড়ানো অবস্থাতেই *তাকবির* এবং দোয়ার পর সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করা হবে।

নামাজের ক্ষেত্রে এটাই সর্বনিম্ন ইবাদত, যার জন্য মুসলমানদের দায়বদ্ধ (*মুকাল্লাফ*) করা হয়েছে।

[নফল নামাজ]

কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজের আগ্রহে নেক কাজ করবে, আল্লাহ তা কবুল করবেন। একইভাবে বলা হয়েছে, বিপদের সময় সবর এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। এই নির্দেশের আলোকে মুসলমানরা এই ফরজ নামাজ ছাড়াও সাধারণত নফল নামাজের আয়োজন করে। রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) যেসব নফল নামাজ পড়েছেন বা পড়তে উৎসাহিত করেছেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হাদিসের কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে।

যাকাত

নামাজের পর যাকাত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মানুষ সাধারণত নিজের মাবুদের উপাসনার জন্য যেসব নিয়ম গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে একটি হলো — নিজের সম্পদ, গবাদি পশু এবং উৎপাদন থেকে একটি অংশ খোদার দরবারে নজরানা হিসেবে পেশ করা। এটাকে সদকা, নিয়াজ, নজরানা বা ভোগ হিসেবে অভিহিত করা হয়।নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-দের ধর্মে যাকাতের মূল অবস্থান এটাই এবং এ কারণেই এটাকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়। কুরআন বেশ কিছু স্থানে যাকাতের জন্য 'সদকা' শব্দ ব্যবহার করেছে এবং স্পষ্ট করেছে যে, এটা অন্তরের বিনয় ও নম্রতা সহকারে আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রচলিত নিয়ম ছিল যে, নজরানা পেশ করার পর তা ইবাদতখানা থেকে তুলে নিয়ে এটার খাদেমদের দেওয়া হতো, যেন তারা ইবাদত করতে আসা মানুষদের সেবা করতে পারে। এখন সেই

পদ্ধতি আর নেই। এর পরিবর্তে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এই সম্পদ *আরবাব-এ-হাল ও আকদ* (রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের) নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে এতে যাকাতের মূল হাকিকতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। এটা খোদার জন্যই নির্ধারিত এবং বান্দারা যখন যাকাত আদায় করে, তখন এটার কবুল হওয়ার ফয়সালাও খোদার দরবার থেকেই হয়।

যাকাতের ইতিহাস

যাকাতের ইতিহাস সেটাই, যা নামাজের ইতিহাস। কুরআন থেকে জানা যায় যে, নামাজের মতো যাকাতের বিধানও নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-দের শরিয়তে সব সময় বিদ্যমান ছিল। আল্লাহতায়ালা যখন মুসলমানদের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন, তখন এটা তাদের জন্য কোনো অপরিচিত বিষয় ছিল না। ইব্রাহিমি ধর্মের সমস্ত অনুসারী যাকাতের নিয়ম সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিল। ফলে এটা আগে থেকেই বিদ্যমান একটি সুন্নাত ছিল, যা নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) খোদাতায়ালার হুকুমে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর মুসলমানদের মধ্যে জারি করেছেন।

যাকাতের উদ্দেশ্য

যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, তবে যাকাতের উদ্দেশ্য এর নাম থেকেই নির্ধারিত হয়। এই শব্দটির মূল হচ্ছে: 'বৃদ্ধি' ও 'পবিত্রতা'। সুতরাং, যাকাত বলতে সেই মাল বা সম্পদকে বোঝায়, যা আত্মিক পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য ব্যয় করা হয়। এর থেকে স্পষ্ট যে, যাকাতের উদ্দেশ্য সেটাই, যা পুরো ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। যাকাত মানুষের নফসকে সেই সব কলুষতা ও আবর্জনা থেকে পাক-পবিত্র করে, যা সম্পদের মোহের কারণে অন্তরে দানা বাঁধে। যাকাত সম্পদে

বরকত সৃষ্টি করে এবং মানুষের আত্মিক পবিত্রতা বৃদ্ধির কারণে পরিণত হয়। আল্লাহর পথে ব্যয় বা *ইনফাকের* এটাই ন্যূনতম দাবি, যা একজন মুসলমানকে সর্বাবস্থায় পূরণ করতে হয়। যেহেতু যাকাত আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রাথমিক ধাপ, তাই এর মাধ্যমে সেই উচ্চতর স্তর হয়তো অর্জিত হয় না, যা আল্লাহর পথে ব্যয়ের সাধারণ বা উচ্চতর দাবিগুলো পূরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়; তবুও যাকাতের মাধ্যমে মানুষের অন্তর তার প্রতিপালকের সাথে জুড়ে যায়। দুনিয়া এবং দুনিয়াবি সহায়-সম্পত্তির প্রতি অত্যাধিক মায়ার কারণে মানুষের মাঝে আল্লাহতায়ালার প্রতি যে গাফিলতি বা উদাসীনতা তৈরি হয়, যাকাত আদায়ের ফলে তা অনেকটা দূর হয়।

যাকাতের বিধান

যাকাতের বিধান নিম্নরূপ:

১. উৎপাদন, ব্যবসা ও বিনিয়োগের উৎসসমূহ, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র এবং নিসাব (নির্ধারিত সীমা)-এর কম সম্পদ — এগুলো ছাড়া কোনো কিছুই যাকাত থেকে ব্যতিক্রম নয়। এটা প্রতিটি সম্পদ, সব ধরনের গবাদি পশু এবং সব ধরনের উৎপাদনের ওপর ধার্য হবে এবং প্রতিবছর রাষ্ট্রের প্রত্যেক মুসলমান নাগরিকের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করা হবে।

২. যাকাতের হার নিম্নরূপ:

- নগদ সম্পদ বা মালের ক্ষেত্রে: বার্ষিক ২.৫% (আড়াই শতাংশ)।
- উৎপাদনের ক্ষেত্রে:

- যদি উৎপাদনে মূলত শ্রম অথবা মূলত পুঁজি ব্যবহার করা হয়, তবে প্রতিবার উৎপাদনের সময় তার ১০%।
- যদি শ্রম ও পুঁজি — উভয়ের সংমিশ্রণে উৎপাদিত হয়, তবে ৫%।
- যদি কোনো শ্রম বা পুঁজি ছাড়াই সরাসরি খোদার দান হিসেবে (যেমন প্রাকৃতিক বনের ফল) পাওয়া যায়, তবে ২০%।

- গবাদি পশুর ক্ষেত্রে:

  ক. উট:

  - ৫ থেকে ২৪টি পর্যন্ত: প্রতি ৫টি উটের জন্য ১টি ছাগল।
  - ২৫ থেকে ৩৫টি পর্যন্ত: ১টি এক বছর বয়সী উটনী; যদি তা না থাকে তবে ১টি দুই বছর বয়সী পুরুষ উট।
  - ৩৬ থেকে ৪৫টি পর্যন্ত: ১টি দুই বছর বয়সী উটনী।
  - ৪৬ থেকে ৬০টি পর্যন্ত: ১টি তিন বছর বয়সী উটনী।
  - ৬১ থেকে ৭৫টি পর্যন্ত: ১টি চার বছর বয়সী উটনী।
  - ৭৬ থেকে ৯০টি পর্যন্ত: ২টি দুই বছর বয়সী উটনী।
  - ৯১ থেকে ১২০টি পর্যন্ত: ২টি তিন বছর বয়সী উটনী।
  - ১২০টির বেশি হলে: প্রতি ৪০টির জন্য ১টি দুই বছর বয়সী মাদি উটনী এবং প্রতি ৫০টির জন্য ১টি তিন বছর বয়সী উটনী।

খ. গরু:

– প্রতি ৩০টির জন্য ১টি এক বছর বয়সী এবং প্রতি ৪০টির জন্য ১টি দুই বছর বয়সী বাছুর।

গ. ছাগল:

– ৪০ থেকে ১২০টি পর্যন্ত: ১টি ছাগল।

– ১২১ থেকে ২০০টি পর্যন্ত: ২টি ছাগল।

– ২০১ থেকে ৩০০টি পর্যন্ত: ৩টি ছাগল।

– ৩০০-এর বেশি হলে: প্রতি ১০০টির জন্য ১টি করে ছাগল।

৩. কুরআনে যাকাতের জন্য যে খাতগুলো বর্ণিত হয়েছে, তার বিবরণ হলো:

- অভাবী ও মিসকিনদের জন্য।
- রাষ্ট্রের সকল কর্মচারীর পারিশ্রমিক হিসেবে।
- ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সকল রাজনৈতিক ব্যয়ের জন্য।
- সব ধরনের দাসত্ব বা গোলামি থেকে মুক্তির জন্য।
- লোকসান, জরিমানা বা ঋণের বোঝায় জর্জরিত মানুষদের সাহায্যের জন্য।
- ধর্মের সেবা এবং জনকল্যাণমূলক কাজে।
- মুসাফিরদের সাহায্য এবং তাদের জন্য রাস্তা, সেতু ও সরাইখানা নির্মাণের জন্য।

৪. যাকাতের একটি প্রকার হচ্ছে: *সদকাতুল ফিতর*। এটা একজন ব্যক্তির সকাল-সন্ধ্যার খাবারের সমপরিমাণ সম্পদ, যা ছোট-বড় প্রত্যেকের জন্য দেওয়া আবশ্যক করা হয়েছে। এটা রমজান শেষে ঈদের নামাজের আগে আদায় করতে হয়।

রোজা

নামাজ ও যাকাতের পরে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত রোজা। আরবি ভাষায় রোজার জন্য 'সওম' শব্দ এসেছে, যার অর্থ: কোনো জিনিস থেকে বিরত থাকা এবং তা পরিত্যাগ করা। শরিয়তের পরিভাষায় এই শব্দ বিশেষ সীমা ও নিয়ম সহকারে পানাহার ও দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটাই মূলত রোজা। মানুষ যেহেতু এই দুনিয়ায় নিজের একটি কর্মময় সত্তাও রাখে, তাই আল্লাহতায়ালার জন্য মানুষের ইবাদতের আবেগ যখন তার কর্মময় সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন উপাসনার সাথে আনুগত্যও শামিল হয়। রোজা এই আনুগত্যেরই প্রতীকী প্রকাশ। এতে বান্দা নিজের প্রতিপালকের আদেশে এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও খুশির অন্বেষণে কিছু বৈধ কাজকে নিজের জন্য হারাম সাব্যস্ত করে আনুগত্যের মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়, আর এভাবে সে নিজের অবস্থা দ্বারা যেন এই কথাই ঘোষণা করে যে, আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর আদেশের চেয়ে বড় কিছু-ই নেই। তিনি যদি *ফিতরাতের* নিয়ম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বৈধ কোনো জিনিসও তার জন্য নিষিদ্ধ করেন, তবে বান্দা হিসেবে শোভনীয় এটাই যে, সে বিনাবাক্যে এই আদেশের সামনে মস্তক অবনত করবে।

একটু চিন্তা করলে দেখবেন যে, আল্লাহর মহিমা ও প্রতাপ এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি ও স্বীকৃতির এই অবস্থা মূলত তাঁর শুকরিয়া আদায়েরই বাস্তবিক প্রকাশ। অতএব, কুরআন এই ভিত্তিতেই

রোজাকে খোদার বড়ত্ব ঘোষণা এবং শুকরিয়া আদায় হিসেবে গণ্য করেছে এবং বলেছে: এই উদ্দেশ্যে রমজান মাসকে এজন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, কুরআনের সুরতে আল্লাহ যে হেদায়েত এই মাসে তোমাদের দান করেছেন — যাতে রয়েছে বুদ্ধি-বিবেকের জন্য দিকনির্দেশনা এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণের স্পষ্ট ও অকাট্য দলিল-প্রমাণাদি — সেটার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করো এবং তাঁর শোকরগুজার হও।

এটার চরম উৎকর্ষ এই যে, মানুষ রোজার অবস্থায় নিজের ওপর আরও কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করে এবং অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে কয়েক দিনের জন্য মসজিদে বসে এবং বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত করে। পারিভাষিকভাবে এটাকে *ইতিকাফ* বলে। *ইতিকাফকে* যদিও রমজানের রোজার মতো আবশ্যক করা হয়নি, কিন্তু *তাজকিয়ায়ে নফস* (আত্মিক পরিশুদ্ধি)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। রোজা, নামাজ ও কুরআন তিলাওয়াতের সংমিশ্রণে যে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং নফসের ওপর নির্জনতা ও আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা যে ছাপ ফেলে, তার মাধ্যমে রোজার আসল উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় অর্জিত হয়।

রোজার ইতিহাস

নামাজের মতো রোজার ইতিহাসও অত্যন্ত প্রাচীন। কুরআন জানাচ্ছে যে, রোজা মুসলমানদের ওপর ঠিক তেমনি ফরজ করা হয়েছে, যেমনি তা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ওপর ফরজ করা হয়েছিল। সুতরাং, বাস্তবতা হচ্ছে: নফসের প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে রোজার ধারণা সমস্ত ধর্মেই রয়েছে।

রোজার উদ্দেশ্য

রোজার উদ্দেশ্য কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে, মানুষ যেন রোজার মাধ্যমে খোদার *তাকওয়া* অবলম্বন করে। কুরআনের পরিভাষায় *তাকওয়ার* অর্থ: মানুষ প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত সীমার ভিতরে রেখে জীবনযাপন করবে এবং নিজের অন্তরের গহীনে এই বিষয়ে ভয় পাবে যে, সে যদি কখনো এই সীমা ভাঙে, তবে এর শাস্তি থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

রোজার নিয়ম-কানুন

রোজার নিময়-কানুন নিম্নরূপ:

- রোজার নিয়তে এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পানাহার ও দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে বিরত থাকাই রোজা।
- এই বিধি-নিষেধ ফজর থেকে রাত শুরু হওয়া পর্যন্ত জারি থাকে, সুতরাং রোজার রাতগুলোতে পানাহার ও দাম্পত্য-সঙ্গীর কাছে যাওয়া পুরোপুরি জায়েজ।
- রোজার জন্য রমজান মাসকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে; তাই যে ব্যক্তি এই মাসে উপস্থিত থাকবে, তার ওপর এই পুরো মাসের রোজা রাখা ফরজ।
- অসুস্থতা বা সফরের কারণে অথবা অন্য কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে মানুষ যদি রমজানের রোজা পূর্ণ করতে না পারে, তবে তার জন্য আবশ্যক যে, অন্য দিনগুলোতে রোজা রেখে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া এবং [*যতগুলো রোজা রাখতে পারেনি, ততগুলো রোজা রেখে*] সংখ্যা পূর্ণ করা।

- *হায়েজ* ও *নেফাসের* অবস্থায় রোজা রাখা নিষিদ্ধ। কিন্তু এভাবে ছেড়ে দেওয়া রোজাগুলোও পরবর্তীতে অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে।

- রোজার চরম উৎকর্ষ হচ্ছে *ইতিকাফ*। আল্লাহতায়ালা যদি কোনো ব্যক্তিকে *ইতিকাফের* তাওফিক দেন, তবে তার উচিত যে, রোজার মাসে যত দিনের জন্য সম্ভব হয়, দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর ইবাদতের জন্য মসজিদে নির্জনবাস অবলম্বন করা এবং কোনো অপরিহার্য মানবিক প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের না হওয়া।

- *ইতিকাফের* জন্য বসলে রোজার রাতে পানাহার করতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু দাম্পত্য-সঙ্গীর কাছে যাওয়া তার জন্য জায়েজ থাকে না। *ইতিকাফের* অবস্থায় আল্লাহতায়ালা এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন।

হজ্জ ও উমরা

হজ্জ ও উমরা উভয়ে ইব্রাহিমি ধর্মে ইবাদতের চরম উৎকর্ষ। হজ্জ ও উমরার ইতিহাস সেই ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয়, যা ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*) মসজিদে হারাম নির্মাণের পর করেছিলেন — যেন মানুষ মহান খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে নজরানা পেশ করতে আসে এবং তাওহিদের ওপর ইমানের যে অঙ্গীকার তারা করেছে, এখানে এসে সেটাকে নবায়ন করে।

নিজ মাবুদের জন্য ইবাদতের আবেগের এটাই শেষ পর্যায় যে, তাঁর আহ্বানে বান্দা নিজের জান ও মাল — সবকিছু তাঁর দরবারে উৎসর্গ করতে হাজির হবে। হজ্জ ও উমরাহ এই উৎসর্গের-ই এক জীবন্ত রূপ। এই উভয় ইবাদত একই বাস্তবতা ধারণ করে। পার্থক্য শুধু এই যে,

উমরাহ যেখানে সংক্ষিপ্ত, সেখানে হজ্জ সেটারই বিস্তারিত রূপ। হজ্জের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য পুরোপুরি ফুটে ওঠে, যার জন্য জান-মাল উৎসর্গের দাবি করা হয়েছে।

আল্লাহতায়ালা জানিয়েছেন যে, আদমের সৃষ্টির মাধ্যমে দুনিয়ায় তাঁর যে পরিকল্পনা শুরু হয়েছে, ইবলিস প্রথম দিন থেকেই সেটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ফলে আল্লাহর বান্দারা এখন কিয়ামত পর্যন্ত তাদের এই চিরশত্রু [শয়তান] ও তার বংশধরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। এটাই এই দুনিয়ার পরীক্ষা, যার সফলতা বা ব্যর্থতার ওপর মানুষের অনন্ত ভবিষ্যতের নির্ভর করছে। আমরা আমাদের জান ও মাল এই যুদ্ধের জন্যই আল্লাহর পথে উৎসর্গ করি। ইবলিসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে-ই হজ্জের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই চিত্রায়ণটি এমন:

- আল্লাহর বান্দারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ এবং এর আনন্দ ও ব্যস্ততা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।
- এরপর 'লাব্বাইক লাব্বাইক' (لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ) বলতে বলতে রণক্ষেত্রে পৌঁছায় এবং ঠিক মুজাহিদদের মতো একটি উপত্যকায় তাঁবু ফেলে অবস্থান নেয়।
- পরের দিন এক খোলা ময়দানে পৌঁছে তারা নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য দোয়া ও মোনাজাত করে এবং নিজের ইমামের খুতবা শোনে।
- যুদ্ধের পরিস্থিতির চিত্রায়ণের দাবি অনুযায়ী তারা নামাজ *কসর* করে ও জমা (বা একত্রে) আদায় করে; এবং পথে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি করে পুনরায় নিজেদের তাঁবুতে ফিরে আসে।

- এরপর শয়তানের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে, নিজেদের পশুর কুরবানি পেশ করার মাধ্যমে নিজেকে মহান রবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে, মাথা মুণ্ডন করে এবং নজরানার *তাওয়াফ* [*অর্থাৎ জিয়ারতের তাওয়াফ*] সম্পন্ন করতে তারা মূল ইবাদতগাহে (কাবা শরিফে) এবং কুরবানিগাহে উপস্থিত হয়।

- তারপর সেখান থেকে ফিরে আসে এবং পরবর্তী দুই বা তিনদিন একইভাবে শয়তানের ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে।

এই দিক থেকে দেখলে, হজ্জ ও উমরাতে 'ইহরাম' এই বিষয়ের প্রতীক যে, মুমিন বান্দা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, ব্যস্ততা ও প্রিয় বস্তুগুলো থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে এবং দুটো সেলাইবিহীন চাদরে নিজের শরীর ঢেকে, খালি মাথায় এবং কিছুটা খালি পায়ে একেবারে সংসারবিরাগীদের বেশ ধারণ করে নিজের প্রতিপালকের দরবারে পৌঁছানোর জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

- 'তালবিয়া' হলো সেই আহ্বানের জবাব, যা সাইয়্যিদুনা ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*) বাইতুল হারামের পুনর্নির্মাণের পর আল্লাহতায়ালার আদেশে একটি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে দিয়েছিলেন। এখন এই আহ্বান দুনিয়ার কোণায় কোণায় পৌঁছেছে এবং আল্লাহর বান্দারা তাঁর নিয়ামতের স্বীকৃতি ও তাঁর তাওহিদের ঘোষণা দিয়ে এই আহ্বানের জবাবে 'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' (لَبَّيْكَ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ)-এর এই হৃদয়স্পর্শী সুরের মূর্ছনা পাঠ করে।

- 'তাওয়াফ' হলো নজরানার প্রদক্ষিণ। ইব্রাহিমি ধর্মে এই ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে যে, যাকে কুরবানি করা হবে অথবা যাকে ইবাদতগাহের খিদমতের জন্য উৎসর্গ

করা হবে, তাকে ইবাদতগাহ বা কুরবানিগাহের সামনে প্রদক্ষিণ করানো হবে।

- 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন বা স্পর্শ করা হলো অঙ্গীকার নবায়নের প্রতীক। এতে বান্দা এই পাথরকে রূপকভাবে নিজের প্রতিপালকের হাত সাব্যস্ত করে সেই হাতে নিজের হাত রাখে এবং অঙ্গীকার ও চুক্তির প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী একে চুম্বন করে নিজের এই অঙ্গীকার নবায়ন করে যে, ইসলাম গ্রহণ করে সে জান্নাতের বিনিময়ে নিজের জান ও মাল — সবই আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছে।

- 'সাই' হলো ইসমাইল (*আলাইহিস সালাম*)-এর কুরবানি-গাহের *তাওয়াফ*। সাইয়্যিদুনা ইব্রাহিম *সাফা* পাহাড়ে দাঁড়িয়ে এই কুরবানিগাহ দেখেছিলেন এবং এরপর আদেশ পালনের জন্য দ্রুতগতিতে হেঁটে *মারওয়ার* দিকে গিয়েছিলেন। সুতরাং *সাফা* ও *মারওয়ার* এই প্রদক্ষিণ হলো নজরানার *তাওয়াফ*, যা প্রথমে মূল ইবাদতগাহের সামনে এবং এরপর কুরবানির জায়গায় সম্পন্ন করা হয়।

- 'আরাফাত' হলো ইবাদতগাহের স্থলাভিষিক্ত, যেখানে শয়তানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের মুজাহিদরা সমবেত হয়, নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায় এবং এই যুদ্ধে সফলতার জন্য দোয়া ও মোনাজাত করে।

- 'মুযদালিফা' হলো পথের যাত্রাবিরতি, যেখানে তারা রাত কাটায় এবং সকালে উঠে ময়দানে নামার আগে আরও একবার দোয়া ও মোনাজাত করে।

- 'রমি' বা পাথর নিক্ষেপ হলো ইবলিসের ওপর অভিশাপ এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতীক। এই কাজ এই সংকল্পের সাথে

করা হয় যে, মুমিন বান্দা ইবলিসের পরাজয় ছাড়া আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। এটা জানা কথা যে, মানুষের এই চিরশত্রু যখন কুমন্ত্রণা দেয়, তখন সে একবার কুমন্ত্রণা দিয়েই দমে যায় না, বরং এই সিলসিলা জারি রাখে। তবে প্রতিরোধ করলে তার আক্রমণ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। তিন দিনের *রমি* এবং এর জন্য প্রথমে বড় ও পরে ছোট *জামারায়* পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে এই বিষয়টি-ই প্রকাশ করে।

- 'কুরবানি' হলো জীবনের মুক্তিপণ (ফিদিয়া) এবং মাথার চুল মুণ্ডন করা এই বিষয়ের প্রতীক যে, নজরানা পেশ করা হয়েছে এবং এখন বান্দা তার মহান রবের আনুগত্য ও চিরস্থায়ী দাসত্বের এই চিহ্ন নিয়ে নিজের ঘরে ফিরতে পারে।

এসব থেকে আন্দাজ করা যায় যে, হজ্জ কতটা অনন্য সাধারণ একটি ইবাদত, যা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের ওপর জীবনে অন্তত একবার ফরজ করা হয়েছে।

হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্য

হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্য সেটাই, যা এগুলোর হাকিকত, অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার নিয়ামতসমূহের স্বীকৃতি, তাঁর তাওহিদের অঙ্গীকার এবং এই কথার স্মরণ করানো যে, ইসলাম কবুল করে আমরা নিজেদেরকে প্রতিপালকের কাছে উৎসর্গ করেছি। এগুলোই সেই বিষয়, যেগুলোর *মারেফত* এবং যেগুলোর হৃদয়-মননে প্রোথিত হওয়াকে কুরআন হজ্জের স্থানসমূহের উপকারিতা হিসেবে অভিহিত করেছে। এই উদ্দেশ্য জিকিরের ঐ শব্দগুলো দ্বারা অত্যন্ত নিপুণভাবে স্পষ্ট হয়, যা এই ইবাদতের জন্য নির্ধারিত। বিষয়টি পরিষ্কার যে, জিকিরের শব্দগুলো এই উদ্দেশ্যকে সামনে তুলে ধরতে এবং মন-মগজে পুরোপুরি

বদ্ধমূল করতে নির্বাচন করা হয়েছে। তাই *ইহরাম* বাঁধার পর এই শব্দগুলো প্রত্যেক ব্যক্তির জবান থেকে অনবরত জারি থাকে:

لَبَّيْكَ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ؛ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ، لَبَّيْكَ؛ اِنَّ
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ؛ لَاشَرِيْكَ لَكَ.

"আমি হাজির, হে আল্লাহ, আমি হাজির; আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই; আমি হাজির; হামদ তোমারই জন্য, সব নিয়ামত তোমারই এবং বাদশাহিও কেবল তোমারই জন্য; তোমার কোনো শরিক নেই।"

হজ্জ ও উমরার দিনসমূহ

উমরার জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। এটা পুরো বছরের মধ্যে মানুষ যখন চায়, তা করতে পারে। হজ্জের জন্য অবশ্য ৮ই জিলহজ্জ থেকে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত দিনসমূহ নির্ধারিত এবং হজ্জ কেবল এই দিনগুলোতেই হতে পারে।

হজ্জ ও উমরার পদ্ধতি

হজ্জ ও উমরার জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত করা হয়েছে, তা এই যে:

১. উমরা

এই ইবাদতের নিয়ত করে *ইহরাম* বাঁধা।

বাইরে থেকে আগতরা এই *ইহরাম* নিজেদের *মিকাত* থেকে বাঁধবেন; আর যারা স্থায়ীভাবে থাকেন — চাই তারা মক্কাবাসী হোন বা সাময়িকভাবে মক্কায় অবস্থানরত হোন — তারা হারামের সীমানার বাইরের কোনো জায়গা থেকে *ইহরাম* বাঁধবেন; এবং যারা এই সীমানার বাইরে, কিন্তু *মিকাতের* ভিতরে বসবাস করেন, তাদের *মিকাত* সেই

জায়গা, যেখানে তারা অবস্থান করছেন এবং তারা সেখান থেকেই *ইহরাম* বাঁধবেন এবং *তালবিয়া* পাঠ করা শুরু করবেন।

বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানো পর্যন্ত *তালবিয়ার* জিকির জারি থাকবে।

সেখানে পৌঁছে বাইতুল্লাহর *তাওয়াফ* করা হবে।

তারপর *সাফা* ও *মারওয়াতে সাই* করা হবে।

হাদির পশু সাথে থাকলে সেগুলো কুরবানি করা হবে।

কুরবানির পর পুরুষরা মাথা মুণ্ডন করে বা চুল কেটে এবং মহিলারা নিজেদের বেণীর শেষ থেকে সামান্য চুল কেটে *ইহরাম* খুলবেন।

এই *ইহরাম* একটি পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে, এখন তারা কামনার কোনো কথা বলবেন না; সাজসজ্জার কোনো কিছু — যেমন: সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না; নখ কাটবেন না, শরীরের কোনো অংশের পশম ফেলবেন না, ময়লা-আবর্জনা দূর করবেন না, এমনকি নিজেদের শরীরের উকুনও মারবেন না; শিকার করবেন না; সেলাই করা কাপড় পরবেন না; নিজেদের মাথা, মুখমণ্ডল ও পায়ের উপরের অংশ খোলা রাখবেন এবং একটি চাদর লুঙ্গি হিসেবে বাঁধবেন ও একটি গায়ে জড়িয়ে নেবেন।

মহিলারা অবশ্য সেলাই করা কাপড় পরবেন এবং মাথা ও পা-ও ঢেকে রাখতে পারবেন। তাদের জন্য কেবল মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রাখা জরুরি।

মিকাত সেই স্থানসমূহকে বলে, যা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগতদের জন্য [মসজিদে] হারামের সীমানা থেকে কিছুটা দূরত্বে নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলোর সামনে তারা *ইহরাম* ছাড়া যেতে পারবে না। এই জায়গাগুলো পাঁচটি:

- মদিনা থেকে আগতদের জন্য 'জুল-হুলাইফা',
- ইয়ামেন থেকে আগতদের জন্য 'ইয়ালামলাম',
- মিসর ও শাম থেকে আগতদের জন্য 'জুহফা',
- নজদ থেকে আগতদের জন্য 'কারন' এবং
- পূর্ব দিক থেকে আগতদের জন্য 'জাতে-ইরক'।

তালবিয়া বলতে —

لَبَّيْكَ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ؛ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ، لَبَّيْكَ؛ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ؛ لَاشَرِيْكَ لَكَ.

লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক; লাব্বাইক লা-শারিকা লাকা, লাব্বাইক; ইন্নাল হামদা ওয়ান নিমাতা লাকা ওয়াল মুলক; লা-শারিকা লাক — এর জিকির বোঝায়, যা *ইহরাম* বাঁধার পরপরই শুরু হয় এবং বাইতুল্লাহ পৌঁছানো পর্যন্ত সমানভাবে জারি থাকে। হজ্জ ও উমরার জন্য এটাই একমাত্র জিকির, যা আল্লাহতায়ালা নির্ধারণ করেছেন।

তাওয়াফ শব্দটি সেই সাত চক্করের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা সব ধরনের নাপাকি থেকে পবিত্র হয়ে বাইতুল্লাহর চারদিকে প্রদক্ষিণ করাকে বোঝায়। এর প্রত্যেক চক্কর *হাজরে আসওয়াদ*[৫] থেকে শুরু হয়ে সেখানেই শেষ হয় এবং প্রতিটি চক্করের শুরুতে *হাজরে আসওয়াদের* 'ইসতিলাম' করা হয়। 'ইসতিলাম' মূলত *হাজরে আসওয়াদকে* চুম্বন করা বা হাত দিয়ে সেটা স্পর্শ করে নিজের হাতে চুমু দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত পরিভাষা। ভিড়ের মধ্যে হাত দিয়ে বা

[৫] এটা বাইতুল্লাহর পুরাতন নির্মাণের পাথর, যা অঙ্গীকার নবায়নের প্রতীক হিসেবে সেটার এক কোণে স্থাপন করা হয়েছে।

হাতের লাঠি দিয়ে বা এই জাতীয় কিছু দিয়ে ইশারা করাও 'ইসতিলাম'-এর জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়।

সাই বলতে *সাফা* ও *মারওয়ার তাওয়াফ*-কে বোঝায়। এটাও সাত চক্কর, যা *সাফা* থেকে শুরু হয়। *সাফা* থেকে *মারওয়া* পর্যন্ত একটি এবং *মারওয়া* থেকে *সাফা* পর্যন্ত দ্বিতীয় চক্কর গণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে শেষ চক্কর *মারওয়াতে* গিয়ে শেষ হয়।

কুরবানির মতো *সাফা* ও *মারওয়ার* এই *সাই*-ও নফল হিসেবে করা হয়। এটা উমরার কোনো আবশ্যিক অংশ নয়। উমরা এটা ছাড়াও আদায় হয়ে যায়।

হাদি শব্দটি সেই পশুদের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেগুলোকে [মসজিদে] হারামে কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অন্য পশু থেকে সেগুলোকে আলাদা রাখার জন্য তাদের শরীরে চিহ্ন দেওয়া হয় এবং গলায় ফিতা পরানো হয়।

২. হজ্জ

উমরার মতো হজ্জের জন্যও প্রথম কাজ এটাই যে, হজ্জের নিয়তে এটার *ইহরাম* বাঁধা।

বাইরে থেকে আগতরা এই *ইহরাম* নিজেদের *মিকাত* থেকে বাঁধবেন; আর যারা স্থায়ীভাবে থাকেন — চাই তারা মক্কাবাসী হোন বা সাময়িকভাবে মক্কায় অবস্থানরত হোন অথবা হারামের সীমানার বাইরে কিন্তু *মিকাতের* ভিতরে বসবাস করেন — তাদের মিকাত সেই জায়গা, যেখানে তারা অবস্থান করছেন এবং তারা সেখান থেকেই *ইহরাম* বাঁধবেন এবং *তালবিয়া* পাঠ শুরু করবেন।

৮ই জিলহজ্জ *মিনার* উদ্দেশ্যে রওনা হবেন এবং সেখানে অবস্থান করবেন।

৯ই জিলহজ্জ সকালে *আরাফাতের* উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

সেখানে পৌঁছে ইমাম জোহরের নামাজের আগে হজ্জের খুতবা দেবেন, তারপর জোহর ও আসরের নামাজ জমা ও *কসর* করে পড়া হবে।

নামাজ থেকে অবসর হয়ে যতক্ষণ সম্ভব হয়, আল্লাহতায়ালার দরবারে *তসবিহ* ও *তাহমিদ, তাকবির* ও *তাহলিল* এবং দোয়া ও মোনাজাত করা হবে।

সূর্যাস্তের পর *মুজদালিফার* উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

সেখানে পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামাজ জমা ও কসর করে পড়া হবে।

রাতে এই ময়দানেই অবস্থান করা হবে।

ফজরের পর এখানেও কিছুক্ষণের জন্য *আরাফাতের* মতোই *তসবিহ* ও *তাহমিদ, তাকবির* ও *তাহলিল* এবং দোয়া ও মোনাজাত করা হবে।

তারপর *মিনার* উদ্দেশ্যে রওনা হবেন এবং সেখানে *জামারাতুল আকাবা*-র কাছে পৌঁছে *তালবিয়া* পাঠ বন্ধ করা হবে এবং এই *জামারা*-তে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করা হবে।

হাদির পশু সাথে থাকলে অথবা মানত ও কাফফারার কোনো কুরবানি ওয়াজিব হয়ে থাকলে, সেই কুরবানি করা হবে।

তারপর পুরুষরা মাথা মুণ্ডন করে বা চুল কেটে এবং মহিলারা নিজেদের বেণীর শেষ থেকে সামান্য চুল কেটে *ইহরামের* পোশাক খুলবেন।

তারপর বাইতুল্লাহতে পৌঁছে সেটার *তাওয়াফ* করা হবে।

ইহরামের সমস্ত বিধি-নিষেধ *তাওয়াফের* সাথেই শেষ হবে, এরপর যদি ইচ্ছা থাকে, তবে নফল হিসেবে *সাফা* ও *মারওয়ার সাই*-ও করা যেতে পারে।

তারপর *মিনাতে* ফিরে এসে দুই বা তিনদিন অবস্থান করা হবে এবং প্রতিদিন প্রথমে *জামারাতুল উলা*, তারপর *জামারাতুল উসতা* এবং এরপর *জামারাতুল উখরা*-তে সাতটি করে কঙ্কর মারা হবে।

সাইয়্যিদুনা ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*)-এর সময় থেকে হজ্জ ও উমরার *মানাসিক* বা বিধান এগুলোই। কুরআন এগুলোতে কোনো পরিবর্তন করেনি, শুধু এতটুকু করেছে যে, এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

এই বিধানসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

প্রথম বিধান হচ্ছে — হজ্জ ও উমরা সম্পর্কিত যে পবিত্রতা আল্লাহতায়ালা প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেগুলোকে সম্মান করা ইমানের দাবি এবং তা সর্বাবস্থায় বহাল থাকা উচিত। তবে অন্যপক্ষ যদি এগুলো মান্য করতে অস্বীকার করে, তাহলে এর বদলে মুসলমানদেরও অধিকার আছে যে, তারা সমপর্যায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কারণ, এ ধরনের পবিত্রতা পারস্পরিকভাবেই টিকে থাকতে পারে; কোনো পক্ষ একা নিজ উদ্যোগে তা বজায় রাখতে পারে না।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে — এই অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। এগুলো

আল্লাহর পবিত্র বিষয়, এগুলো ভাঙার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া নিকৃষ্টতম অপরাধ। এ ধরনের পদক্ষেপে লিপ্ত হওয়া কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়।

তৃতীয় বিধান হচ্ছে — *ইহরাম* অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা কেবল স্থলচর প্রাণীদের জন্য; জলজ প্রাণী শিকার করা বা অন্যের করা শিকার খাওয়া — উভয়ই জায়েজ। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ এই ছাড়ের সীমা অতিক্রমের চেষ্টা করবে। স্থলভাগের শিকার সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি জেনেবুঝে এই গুনাহের কাজ করে, তবে তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে।

কাফফারা আদায়ের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে:

- যে ধরনের প্রাণী শিকার করা হয়েছে, গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু থেকে একই শ্রেণির কোনো পশু কুরবানির জন্য বাইতুল্লাহ-তে পাঠানো হবে।
- এটা সম্ভব না হলে, সেই প্রাণীর মূল্যের অনুপাতে মিসকিনদের খাওয়ানো হবে।
- এটাও কঠিন হলে, যতজন মিসকিনকে খাওয়ানো কারও ওপর আবশ্যক হতো — ততদিন রোজা রাখা হবে।

পশুর বিনিময় কী হবে, কিংবা পশু কুরবানি অসম্ভব হলে তার মূল্য কত হবে, অথবা তার বিনিময়ে কতজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো হবে, বা কতগুলো রোজা রাখা হবে — তার ফয়সালা মুসলমানদের মধ্য থেকে দুইজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করবেন, যেন অপরাধীর জন্য নিজের নফসের প্রতি পক্ষপাতের কোনো সুযোগ অবশিষ্ট না থাকে।

চতুর্থ বিধান হচ্ছে — হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে সফরকারীরা যদি কোনো জায়গায় আটকা পড়ে এবং তাদের জন্য সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব না হয়, তবে উট, গরু, ছাগল — এর মধ্য থেকে যা সহজলভ্য, তা কুরবানির জন্য পাঠাবে; আর পাঠানো সম্ভব না হলে সেখানেই কুরবানি করবে এবং মাথা মুণ্ডন করে *ইহরাম* খুলবে। তাদের হজ্জ ও উমরা এটাই। তবে এ বিষয়ে এই কথা স্পষ্ট থাকা উচিত যে, কুরবানি এমন কোনো স্থানে করা হোক কিংবা তা মক্কা ও *মিনায়* করা হোক — কুরবানির আগে মাথা মুণ্ডন করা জায়েজ নয়; যদি না কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয় কিংবা তার মাথায় কোনো কষ্ট থাকে এবং সে কুরবানির আগেই মাথা মুণ্ডন করতে বাধ্য হয়। কুরআন অনুমতি দিয়েছে যে, এ ধরনের বাধ্যবাধকতা দেখা দিলে মানুষ মাথা মুণ্ডন করবে, কিন্তু রোজা বা সদকা বা কুরবানির মাধ্যমে তার ফিদিয়া দেবে এবং সেগুলোর সংখ্যা ও পরিমাণ নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী যা উপযুক্ত মনে হবে, তা নির্ধারণ করবে।

পঞ্চম বিধান হচ্ছে — বাইর থেকে আগমনকারীরা যদি এক সফরে হজ্জ ও উমরা — দুটোই একসাথে করতে চান, তাহলে করতে পারেন। এর পদ্ধতি হলো: তারা আগে উমরা করে *ইহরাম* খুলবেন, তারপর ৮ই জিলহজ্জ মক্কাতেই পুনরায় *ইহরাম* বেঁধে হজ্জ করবেন। এটা মূলত একটি ছাড় বা অবকাশ, যা আল্লাহতায়ালা দুইবার সফরের কষ্টের কথা বিবেচনা করে বাইরে থেকে আগত হজ্জ পালনকারীদের দান করেছেন। সুতরাং তারা এর ফিদিয়া দেবেন। এর দুটি পদ্ধতি রয়েছে:

- উট, গরু এবং ছাগলের মধ্য থেকে যে প্রাণী সহজলভ্য, তা কুরবানি করা।

- এটা সম্ভব না হলে দশটি রোজা রাখা: তিনটি হজ্জের দিনগুলোতে এবং সাতটি হজ্জ থেকে ফেরার পর।

এখান থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহতায়ালার কাছে উত্তম এটাই যে, হজ্জের জন্য আলাদা এবং উমরার জন্য আলাদা সফর করা। সুতরাং কুরআন স্পষ্ট করেছে যে, এই সুবিধা ঐ লোকদের জন্য নয়, যাদের ঘরবাড়ি মসজিদুল হারামের নিকটে।

ষষ্ঠ বিধান হচ্ছে — *মিনা* থেকে ১২ই জিলহজ্জ তারিখেও ফিরে আসা যাবে এবং চাইলে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্তও অবস্থান করা যাবে। আল্লাহতায়ালা জানিয়েছেন যে, উভয় অবস্থাতে কোনো গুনাহ নেই। কারণ, আসল গুরুত্ব এটা নয় যে, মানুষ কতদিন অবস্থান করল, বরং গুরুত্ব হলো — যতদিনই থাকুক, খোদাতায়ালাকে স্মরণে রেখে এবং তাঁকে ভয় করে অবস্থান করুক।

কুরবানি

দুনিয়ার সকল ধর্মেই কুরবানি আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের একটি বড় মাধ্যম হিসেবে বিদ্যমান। কুরবানির হাকিকত সেটাই, যা যাকাতের। তবে কুরবানি সম্পদের ক্ষেত্রে নয়, বরং প্রাণের নজরানা, যা সেই পশুর বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, যাকে আমরা প্রাণের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে কুরবানি করি।

কুরবানির ইতিহাস

এটার ইতিহাস আদম (*আলাইহিস সালাম*)-এর সময় থেকে শুরু হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তার দুই ছেলে (হাবিল ও কাবিল) নিজ নিজ নজরানা আল্লাহতায়ালার দরবারে পেশ করলে একজনের নজরানা কবুল করা হয় এবং অন্যজনেরটা কবুল করা হয়নি। বাইবেলে স্পষ্ট

উল্লেখ আছে যে, হাবিল এই উপলক্ষে তার ভেড়া-ছাগল থেকে প্রথম জন্ম নেওয়া কিছু বাচ্চার কুরবানি পেশ করেছিল।

স্বাভাবিকভাবেই এ পদ্ধতি পরবর্তীতেও বহাল ছিল। ফলে সব ধর্মেই এর নিদর্শন আমরা সমস্ত ধর্মে দেখতে পাই। সাইয়্যিদুনা ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*)-এর কুরবানির পর অবশ্য এই ইবাদত যে গুরুত্ব, মহিমা, ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা লাভ করেছে, তা এর আগে নিঃসন্দেহে ছিল না। তাকে যখন এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি পুত্রের পরিবর্তে পশু কুরবানি করবেন, তখন আল্লাহতায়ালা বললেন — আমরা ইসমাইলকে 'এক মহান যবেহ'-এর বিনিময়ে মুক্ত করেছি। এর অর্থ হচ্ছে: ইব্রাহিমের এই নজরানা কবুল করা হয়েছে এবং এখন বংশপরম্পরায় মানুষ নিজেদের কুরবানির মাধ্যমে এই ঘটনার স্মৃতি বজায় রাখবে। হজ্জ ও উমরা উপলক্ষে এবং ঈদুল আজহার দিনে এই কুরবানি-ই আমরা নফল ইবাদত হিসেবে পূর্ণ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করি।

কুরবানির উদ্দেশ্য

এটার উদ্দেশ্য আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া আদায় করা। আমরা যখন কুরবানির পশুগুলোকে আমাদের প্রাণের নজরানার প্রতীক বানিয়ে খোদাতায়ালার দরবারে পেশ করি, তখন যেন ইসলাম ও বিনয়ের সেই হেদায়েতের জন্য আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া আদায় করি, যার বহিঃপ্রকাশ সাইয়্যিদুনা ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*) তার একমাত্র পুত্রের কুরবানি দেওয়ার মাধ্যমে করেছিলেন। এই উপলক্ষে *তাকবির* ও *তাহলিলের* শব্দগুলোও এই উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়।

যদি ভেবে দেখেন, তবে এটা ইবাদতের চূড়ান্ত শিখর। আমরা নিজেদের এবং নিজেদের পশুর মুখ কিবলার দিকে করে 'বিসমিল্লাহি,

ওয়াল্লাহু আকবার' বলে কিয়াম বা সেজদার অবস্থায় এই অনুভূতির সঙ্গে নিজেদের পশুগুলোকে প্রতিপালকের নামে উৎসর্গ করি যে, প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদেরকেই আল্লাহর চরণে উৎসর্গ করছি।

কুরবানির নিয়ম

এটার নিয়ম হচ্ছে:

- কুরবানি গৃহপালিত চতুষ্পদ শ্রেণির সমস্ত পশুর হতে পারে।
- এটার পশু ত্রুটিমুক্ত এবং উপযুক্ত বয়সের হওয়া উচিত।
- কুরবানির সময় 'ইয়াওমুন নাহর' — ১০ই জিলহজ্জ ঈদুল আজহার নামাজ থেকে অব্যাহতির পর শুরু হয়।
- এটার দিনগুলো সেগুলোই, যা *মুজদালিফা* থেকে ফেরার পর মিনায় অবস্থানের জন্য নির্ধারিত। পারিভাষিকভাবে এগুলোকে *আইয়ামে তাশরিক* বলা হয়। কুরবানি ছাড়াও এই দিনগুলোতে এই সুন্নাতও কায়েম করা হয়েছে যে, প্রত্যেক নামাজের জামাতের পর *তাকবির* বলা হবে। নামাজের পর *তাকবিরের* এই নির্দেশ সাধারণ। এটার জন্য কোনো বিশেষ শব্দ শরিয়তে নির্ধারণ করা হয়নি।
- কুরবানির গোশত মানুষ নিজেও কোনো দ্বিধা ছাড়াই খেতে পারে এবং অন্যদেরও খাওয়াতে পারে।

২. সামাজিক বিধি-বিধান

মানুষের স্রষ্টা তাকে একটি সমাজপ্রিয় প্রাণীর *ফিতরা/ত* দান করেছেন। এর কারণ, মানুষের সৃষ্টি এভাবে হয় না যে, তার স্রষ্টা তাকে আসমানে কোথাও বানিয়ে ভরা যৌবন দিয়ে সরাসরি জমিনে নাজিল করেন; অতঃপর বার্ধক্য ও জরাগ্রস্ত হওয়ার পর্যায়গুলো অতিক্রম করানো ছাড়াই ঐ যৌবন অবস্থাতেই তাকে ফিরিয়ে নেন। এর বিপরীতে মানুষের বিষয়টি এমন যে, সে স্তরে স্তরে অন্ধকারের মধ্যে এক অসহায় শিশুরূপে অস্তিত্ব লাভ করে। মায়ের কোলে চোখ খোলে। আধো আধো কথা বলে, খেলাধুলা করে, অন্যের হাত দিয়ে খায়, পান করে এবং নিজের প্রয়োজনগুলো পূরণ করে। সে প্রথমে জমিনে হামাগুড়ি দেয়, হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে চলে এবং তারপর অনেক কষ্টে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর যোগ্য হয়। এর পরেও কদমে কদমে তার সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এমনকি শৈশব ও কৈশোরের অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে সে পনেরো বা ষোলো বছরের বয়সে পৌঁছে কোথাও গিয়ে যুবক হয়। তার এই যৌবনকালও বিশ-ত্রিশ বছরের বেশি দীর্ঘ হয় না। এরপর সে দেখতে পায়, বার্ধক্যের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে; এবং বহুবার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চরম শিখর স্পর্শ করার পর সে আবার অসহায় শিশুদের মতো অন্যের দয়া ও করুণার ওপর জীবনের দিনগুলো পূর্ণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

মানুষের এই অবস্থা অনিবার্যভাবে দাবি করে যে, সে এক সমাজপ্রিয় সত্তার জীবনযাপন করবে। নারী ও পুরুষ হিসেবে এই সমাজবদ্ধতা সৃষ্টির শুরু থেকেই সম্পূর্ণভাবে স্বয়ং মানুষের ভিতরেই লুকানো থাকে। এটাকে খুঁজে বের করতে তাকে নিজের অস্তিত্বের বাইরে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। সে এই দুনিয়ায় আসে তখন নিজের জীবন-সামগ্রী এবং ঘর-সংসার সাথে নিয়েই আসে, আর তা উপত্যকা ও পর্বতমালা হোক কিংবা তা মরুভূমি ও প্রান্তর হোক — সব জায়গায় সে নিজের মজলিস নিজেই সাজিয়ে নেয়।

মানুষের ইতিহাস বলে, তার সৃষ্টির মাঝে নিহিত এই পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সাইয়্যিদুনা আদম (*আলাইহিস সালাম*) যখন প্রথম মানুষ হিসেবে এই দুনিয়ায় আসেন, তখন তাকে একা পাঠানো হয়নি, বরং তার সাহচর্যের জন্য আল্লাহতায়ালা তারই প্রজাতি থেকে তার জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তারপর তা থেকে বহু নারী ও পুরুষ দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন, এমনকি [এর ধারাবাহিকতায়] পরিবার, গোত্র এবং পরিশেষে রাষ্ট্রিয় পর্যায় পর্যন্ত সমাজব্যবস্থা অস্তিত্বে এসেছে, যাতে মানুষের জন্য সেসব জিনিস সহজলভ্য হয়ে গেল, যা তার গোপন সক্ষমতাগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য ছিল।

এই বাস্তবতাগুলোকে সামনে রেখেই নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-দের ধর্মে স্বামী-স্ত্রীর স্থায়ী সাহচর্যের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষকে তার শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সামনে রাখলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তার জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক প্রয়োজনের নিরিখে এই পদ্ধতি-ই বুদ্ধি ও *ফিতরাতের* অনুকূল। স্বামী-স্ত্রীর স্থায়ী সম্পর্কের মাধ্যমে যে সমাজব্যবস্থা অস্তিত্বে আসে, তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানুষের বুদ্ধি-বিবেকের পথনির্দেশের জন্য নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-দের মাধ্যমে মানবজাতিকে একটি বিস্তারিত বিধি-বিধান

দেওয়া হয়েছে। সেই বিধি-বিধানকে আমরা নিম্নোক্ত শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করতে পারি:

নিকাহ (বিবাহ)

নারী ও পুরুষের একে অপর থেকে যৌন তৃপ্তি অর্জনের বৈধ পদ্ধতি কেবল *নিকাহ* (বিবাহ)। প্রকাশ্যে *ইজাব* ও কবুলের সাথে এটা নারী ও পুরুষের মধ্যে স্থায়ী সাহচর্যের একটি অঙ্গীকার, যা মানুষের সামনে এবং কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে এই উপলক্ষে জিকির ও নসিহতের পর পূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়। বিবাহের জন্য নারীরাও পুরুষদের মতো নিজের ইচ্ছার মালিক এবং খোদায়ি সীমার ভিতরে নিজের ফয়সালা করার জন্য পুরোপুরি স্বাধীন। তাদের সম্মতি ছাড়া কোনো কিছুই তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

মাহরামগণ

মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাগনি এবং ভাতিজির সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ। আল্লাহতায়ালা চান যে, মায়ের জন্য ছেলে, মেয়ের জন্য বাবা, বোনের জন্য ভাই, ফুফুর জন্য ভাতিজা, খালার জন্য ভাগনে, ভাগনির জন্য মামা এবং ভাতিজির জন্য চাচার দৃষ্টি যৌনতা ও কামনার সব ধরনের কলুষতা থেকে মুক্ত থাকুক। কারণ, [আত্মীয়তার] এই বন্ধনগুলোতে এ ধরনের সম্পর্ক মানব মর্যাদা বিধ্বংসী এবং লজ্জা ও শরমের সেই পবিত্র অনুভূতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যা মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির কারণ। দুধপানের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পর্কের বিধানও একই। অতএব, বংশীয় সম্পর্কের কারণে যেসব সম্পর্ক হারাম হয়, দুগ্ধপানের কারণেও সেসব সম্পর্ক হারাম হয়। বংশ ও দুগ্ধপানের পর একটি

সম্পর্ক হচ্ছে: বৈবাহিক। এ থেকে যে সম্পর্কগুলো তৈরি হয়, সেগুলোর পবিত্রতাও মানব *ফিতরাতের* নিকট সুস্পষ্ট। সে অনুযায়ী শ্বশুরের জন্য পুত্রবধূ এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীর মা, [পূর্বের ঘরের] মেয়ে, বোন, খালা, ফুফু, ভাগনি ও ভাতিজির সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে এই সম্পর্কগুলো যেহেতু স্ত্রী ও স্বামীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর ফলে এগুলোর মধ্যে এক ধরনের দুর্বলতা তৈরি হয়, তাই কুরআন এতে এই তিনটি শর্তারোপ করেছে:

এক — [পূর্বের ঘরের] মেয়ে কেবল সেই স্ত্রীর হারাম, যার সাথে নির্জনবাস (সহবাস) করা হয়েছে।

দুই — পুত্রবধূ হারাম হওয়ার জন্য ছেলে ঔরসজাত হওয়া জরুরি।

তিন — স্ত্রীর বোন, ফুফু, খালা, ভাগনি ও ভাতিজির হারাম হওয়ার বিষয়টি ঐ অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট, যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।

এই সম্পর্কগুলো ছাড়াও সৎ মায়ের সাথে এবং সেই নারীর সাথেও বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যে অন্যের বিবাহে আবদ্ধ রয়েছে।

সীমা ও শর্তাবলি

বিবাহ মালের বিনিময়ে অর্থাৎ মোহরানার সাথে হতে হবে। কুরআন বলেছে যে, আল্লাহতায়ালার আরোপিত একটি ফরজ হিসেবে এটা বিবাহের একটি আবশ্যক শর্ত। নারী ও পুরুষের বিবাহের মাধ্যমে স্থায়ী সাহচর্যের যে অঙ্গীকার করে, তাতে আজীবন ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষই পালন করে আসছে; এবং এটা তার-ই প্রতীক (token)। এর কোনো পরিমাণ নির্ধারিত করা হয়নি। এটাকে সমাজের প্রথা ও মানুষের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব, নারীর

সামাজিক মর্যাদা এবং পুরুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে তারা যতটুকু মোহরানা চায়, নির্ধারণ করতে পারে।

বিবাহের জন্য চারিত্রিক পবিত্রতাও জরুরি। কোনো ব্যভিচারী কোনো পবিত্রা নারীর সাথে এবং কোনো ব্যভিচারিণী কোনো পবিত্র পুরুষের সাথে বিবাহ করতে পারে না; তবে এ শর্তে যে, যদি বিষয়টি আদালত পর্যন্ত না পৌঁছায় এবং তারা তওবা ও *ইস্তিগফারের* মাধ্যমে নিজেদের এই গুনাহ থেকে পবিত্র করে। শিরকের বিষয়টিও একই। যেভাবে এই বিষয়টি মেনে নেওয়া যায় না যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কেউ অন্য কারও বিছানায় শোবে, ঠিক তেমনি এটাও কোনো মুসলমানের জন্য সহনীয় হতে পারে না যে, তার ঘরে খোদাতায়ালার সাথে অন্য কারও উপাসনা করা হবে, বরং এটা তার কাছে অন্য কারও বিছানায় শোয়ার চেয়েও বেশি ঘৃণ্য বিষয় হবে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে অবশ্য এতটুকু শিথিলতা আছে যে, তাদের পবিত্রা নারীদের সাথে আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন। এর কারণ, শিরকের মতো নাপাকিতে পুরোপুরি লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা মূলত তাওহিদে বিশ্বাসী।

অধিকার ও অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি একটি ছোট রাষ্ট্রের মতো। যেভাবে প্রতিটি রাষ্ট্র তার প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকার জন্য একজন প্রধান বা নেতৃত্বের দাবি রাখে, তেমনি এই রাষ্ট্রটিও একজন প্রধানের দাবি রাখে। এই রাষ্ট্রে নেতৃত্বের স্থান পুরুষকেও দেওয়া যায় এবং নারীকেও [দেওয়া যায়]। কুরআন জানিয়েছে যে, পুরুষের কিছু সৃষ্টিগত সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটা তাকে দেওয়া হয়েছে এবং এর আবশ্যিক ফল হিসেবে নারীদের নিকট দাবি করা হয়েছে যে, প্রথমত, তাদের উচিত

স্বামীদের সাথে সদ্ভাব ও আনুগত্যের আচরণ অবলম্বন করা। দ্বিতীয়ত, স্বামীর গোপন বিষয়সমূহ এবং তার ইজ্জত ও সম্মানের হেফাজত করা।

নারী যদি স্বামীর এই অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে ঘরের শৃঙ্খলা ওলটপালট করতে উদ্যত হয়, তবে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন যে, নিজের ঘর বাঁচানোর জন্য পুরুষ তিনটি পথ অবলম্বন করতে পারে:

প্রথমত — নারীকে নসিহত করা। কুরআনে এর জন্য 'ওয়াজ' (وعظ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ: এক্ষেত্রে কিছুটা শাসন বা তিরস্কারও করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত — তার সাথে ঘনিষ্ঠতা বা মেলামেশা বর্জন করা, যাতে সে বুঝতে পারে যে, সে যদি নিজের আচরণ পরিবর্তন না করে, তবে এর ফলাফল অস্বাভাবিক হতে পারে।

তৃতীয়ত — নারীকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া। এই শাস্তি কেবল ততটুকুই হতে পারে, যতটুকু একজন শিক্ষক তার প্রশিক্ষণাধীন ছাত্রকে অথবা একজন বাবা তার সন্তানকে দেয়।

এই তিনটি পদ্ধতিই পর্যায়ক্রমিক ও ধাপে ধাপে ব্যবহারের জন্য। অর্থাৎ প্রথমটির পর দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টির পর তৃতীয় পদ্ধতি কেবল তখনই অবলম্বন করা উচিত, যখন ব্যক্তি নিশ্চিত হয় যে, এতে কাজ হয়নি এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। স্বামীর সংশোধনমূলক ক্ষমতার এটাই শেষ সীমা। এর মাধ্যমে যদি সংশোধন হয়, তবে নারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার পথ খোঁজা উচিত নয়।

স্ত্রী যদি অপছন্দনীয়ও হয়, তবুও তার কাছ থেকে নিজের দেওয়া উপঢৌকন বা সম্পদ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাকে সংকটে ফেলা এবং

কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করা কোনো মুমিন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়। এ ধরনের আচরণ কেবল তখনই গ্রাহ্য করা যেতে পারে, যখন সে প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। এ জাতীয় কোনো কাজ যদি তার দ্বারা প্রকাশ না পায়, সে নিজের আনুগত্যে অটল থাকে এবং পবিত্রতার সাথে জীবনযাপন করে, তবে কেবল স্ত্রী পছন্দ নয় — এই ভিত্তিতে তাকে কষ্ট দেওয়া ন্যায়বিচার এবং মহত্ত্ব ও আভিজাত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। চারিত্রিক কলুষতা অবশ্যই ঘৃণ্য বিষয়, কিন্তু কেবল চেহারা পছন্দ না হওয়া বা রুচির অমিলের কারণে তাকে ভদ্রোচিত সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সেই আচরণ করা উচিত, যা ভদ্রলোকদের জন্য শোভনীয়, বুদ্ধি-বিবেক ও *ফিতরাতের* অনুকূল, দয়া ও সহমর্মিতা-ভিত্তিক এবং যাতে ন্যায়বিচারের দাবিগুলো রক্ষা করা হয়।

বহুবিবাহ

মানুষের সৃষ্টি যে *ফিতরাতের* ওপর হয়েছে, তার আলোকে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি তার আসল গুণাবলিসহ একজন পুরুষ ও নারীর বিবাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। সভ্যতার প্রয়োজন এবং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের কারণে বহুবিবাহের প্রথা কম-বেশি প্রতিটি সমাজেই বিদ্যমান ছিল; এবং এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেই আল্লাহতায়ালা তাঁর কোনো শরিয়তেই এটাকে নিষিদ্ধ করেননি। তবে এতিমদের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে কুরআন যখন এই প্রথা থেকে উপকার নেওয়ার উৎসাহ দিয়েছে, তখন এর সাথে এই দুটি শর্তও আরোপ করেছে:

এক — এতিমদের অধিকার রক্ষার মতো কল্যাণের জন্যও কোনো ব্যক্তির বিবাহে নারীর সংখ্যা চারের বেশি হওয়া উচিত নয়।

দুই — স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফের শর্তটি এমন এক অটল শর্ত যে, ব্যক্তি যদি এটা পূরণ করতে সক্ষম না হয়, তবে এ ধরনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কল্যাণের কারণেও একের অধিক বিবাহ করা তার জন্য বৈধ নয়।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, বাহ্যিক আচরণ এবং অন্তরের টানের মধ্যে কোনো দিক থেকে কোনো পার্থক্য অবশিষ্ট থাকবে না। এ ধরনের ইনসাফ কারও সাধ্যের মধ্যে নেই এবং কেউ চাইলেও তা করতে পারে না। অন্তরের ঝোঁকের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সুতরাং এতটুকুই যথেষ্ট যে, স্বামী এক স্ত্রীর দিকে এমনভাবে ঝুঁকে না পড়ে, যাতে অন্যজন একেবারে ঝুলে থাকার অবস্থায় পৌঁছে যায়।

বিবাহ এতিমদের অধিকার দেখাশোনার জন্য করা হোক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে — মোহরানা এবং ইনসাফ নারীর অধিকার এবং এটা অত্যন্ত আনন্দের সাথে আদায় করা উচিত। কিন্তু যদি আশঙ্কা থাকে যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমান অধিকারের বেলায় অনড় থাকার ফলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করবে বা পিছু ছাড়ানোর চেষ্টা করবে, তবে এতে কোনো ক্ষতি নেই যে, যদি উভয় মিলে নিজেদের মধ্যে কোনো সমঝোতা করে নেয়।

সহবাসের সীমারেখা

হায়েজ (ঋতুস্রাব) ও *নেফাস* (সন্তান প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব)-এর দিনগুলোতে স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। এই বিধিনিষেধ রক্ত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকে, এরপর তা আর থাকে না। তবে সঠিক পদ্ধতি হলো, যখন নারী গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে, তখনই তার সাথে মিলিত হওয়া উচিত এবং [*এই মিলন*] অবশ্যই সেই পথেই হতে হবে, যা আল্লাহ এর জন্য নির্ধারণ করেছেন।

ইলা

কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখা বৈধ নয়। এমনকি যদি এর জন্য কসমও খাওয়া হয়, তবে তা ভেঙে ফেলা জরুরি। এর জন্য চার মাস সময় নির্ধারিত। স্বামী বাধ্য যে, এই সময়ের মধ্যে হয় সে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করবে, অথবা তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তাকে তালাক দেবে।

জিহার

যদি কোনো ব্যক্তি মুখ ফসকে স্ত্রীকে নিজের মায়ের সাথে, অথবা স্ত্রীর কোনো অঙ্গকে মায়ের কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করে, তবে এর মাধ্যমে স্ত্রী মা হয়ে যায় না এবং সেই মর্যাদা লাভ করে না, যা মায়ের প্রাপ্য। অতএব, এ ধরনের তুলনার মাধ্যমে না কারও বিবাহ ভেঙে যায়, আর না তার স্ত্রী তার জন্য মায়ের মতো হারাম হয়ে যায়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তাকে কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হবে। মানুষের সামাজিক জীবনে এ ধরনের কথার প্রভাব অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয়, এ কারণে জরুরি যে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্কতা অবলম্বন করে এবং অন্যরাও এ থেকে শিক্ষা পায়। তাই আল্লাহতায়ালার ফয়সালা হলো, স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে স্বামীকে নিজের গুনাহের কাফফারা আদায় করতে হবে। এই কাফফারা নিম্নরূপ:

- একটি দাস বা দাসী মুক্ত করা।
- সেটা সম্ভব না হলে টানা দুই মাস রোজা রাখা।
- এটাও সম্ভব না হলে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।

তালাক

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ না হলে নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-দের ধর্মে বিচ্ছেদের অবকাশ সবসময়ই ছিল। পারিভাষিকভাবে এটাকে 'তালাক' বলা হয়। এ পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে প্রত্যেকের এই ইচ্ছা থাকা উচিত যে, যে সম্পর্ক একবার স্থাপিত হয়েছে, সেটাকে যতটা সম্ভব ভেঙে যাওয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। কিন্তু সংশোধনের সম্ভাব্য সব উপায় অবলম্বনের পরেও যদি পরিস্থিতির উন্নতি না হয় এবং পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এখন আর এই সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব নয়, তবে তালাকের আগে সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে আল্লাহতায়ালা স্বামী-স্ত্রীর গোত্র, সমাজ এবং তাদের আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন এগিয়ে আসে এবং নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে বিষয়গুলো মিমাংসার চেষ্টা করে। এর পদ্ধতি এভাবে বলা হয়েছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন করে সালিশ (বিচারক) নিযুক্ত করা হবে এবং তারা উভয় মিলে তাদের মধ্যে সমঝোতা করাবে। এতে প্রত্যাশা করা যায়, যে বিবাদ দুই পক্ষ নিজেরা মীমাংসা করতে সফল হয়নি, তা পরিবারের মুরুব্বি এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীলদের হস্তক্ষেপে মিটে যাবে।

পুরুষ পরিবারের প্রধান, আবার ভরণপোষণ ও অন্যান্য খরচের দায়িত্বও তার ওপর। তাই তালাকের অধিকারও তাকেই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং নারী যদি বিচ্ছেদ চায়, তবে সে তালাক দেবে না; বরং স্বামীর কাছে তালাকের দাবি করবে। সাধারণ অবস্থায় প্রত্যাশা এটাই যে, যেকোনো সজ্জন ব্যক্তি জীবনধারণের কোনো পথ না পেয়ে এই দাবি মেনে নেবেন; কিন্তু যদি এমনটা না হয়, তবে নারী আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে, যা স্বামীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেবে, অথবা বিবাহ বাতিলের ফয়সালা করবে।

স্বামী নিজে তালাক দিক কিংবা স্ত্রীর দাবিতে তাকে পৃথক করার ফয়সালা করুক — উভয় ক্ষেত্রেই কুরআনে যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

১. তালাক *ইদ্দতের* বিবেচনায় দেওয়া হবে। এর অর্থ: স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ পৃথক করার জন্য তালাক দেওয়া বৈধ নয়। তালাক যখন দেওয়া হবে, তখন একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর পৃথক হওয়ার নিয়তে দেওয়া হবে। পারিভাষিকভাবে 'ইদ্দত' শব্দটি সেই মেয়াদের জন্য ব্যবহৃত হয়, যাতে স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ করতে পারে না। যেহেতু এই মেয়াদ মূলত নির্ধারণই করা হয়েছে নারীর গর্ভের অবস্থা পুরোপুরি স্পষ্ট হওয়ার জন্য, তাই জরুরি হলো স্ত্রীকে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর এবং তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন না করেই তালাক দেওয়া।

২. *ইদ্দত* অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গণনা করা উচিত। তালাকের বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল, এ থেকে নারী-পুরুষ এবং তাদের সন্তান ও পরিবারের জন্য অনেক আইনি সমস্যা তৈরি হয়। তাই জরুরি হলো, যখন তালাক দেওয়া হবে, তখন এর সময় ও তারিখ মনে রাখা এবং এটাও মনে রাখা যে, তালাকের সময় নারীর অবস্থা কেমন ছিল, *ইদ্দত* কখন শুরু হয়েছে, এটা কতদিন বহাল থাকবে এবং কবে শেষ হবে।

৩. *ইদ্দত* পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বামীর প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে। স্বামী যদি প্রত্যাবর্তন না করে, তবে *ইদ্দত* পূর্ণ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ হবে। সুতরাং এটা যখন সমাপ্তির পথে থাকবে, তখন স্বামীর ফয়সালা করা উচিত যে, সে স্ত্রীকে

রাখবে, নাকি বিদায় করবে। উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম হলো: বিষয়টি 'মারুফ' অনুযায়ী অর্থাৎ উত্তম পন্থায় হতে হবে। এ বিষয়ে স্বয়ং কুরআনে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা হলো:

প্রথমত, স্ত্রীকে কোনো সম্পদ, সম্পত্তি, অলংকার ও পোশাকাদি ইত্যাদি — তা যত মূল্যেরই হোক না কেন — যদি উপহার হিসেবে দেওয়া হয়, তবে তা ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। ভরণপোষণ এবং মোহরানা নারীর অধিকার, সেগুলো ফেরত নেওয়া বা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এগুলি ছাড়া যা কিছু দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারেও কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে: সেগুলো কখনো ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। তবে দুটি অবস্থা এর ব্যতিক্রম:

এক — স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খোদায়ি সীমারেখা অনুযায়ী মিলমিশ সম্ভব না হয়, সমাজের দায়িত্বশীলরাও যদি সেটাই অনুভব করেন, কিন্তু স্বামী কেবল এ কারণে তালাক দিতে রাজি না হয় যে, তার দেওয়া সম্পদগুলোও এর সাথে চলে যাবে — তবে স্ত্রী এই সম্পদ বা এর কিছু অংশ ফেরত দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিতে পারে। যদি কখনো এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তবে স্বামীর জন্য তা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নয়।

দুই — স্ত্রী যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। এতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তিই ধসে পড়ে, তাই স্বামীর জন্য বৈধ যে, এই অবস্থায় সে নিজের দেওয়া সম্পদ স্ত্রীর কাছ থেকে ফিরিয়ে নেবে।

দ্বিতীয়ত, স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে বা তার মোহরানা নির্ধারিত হওয়ার আগে তালাক দেওয়া হলে মোহরানার বিষয়ে স্বামীর

কোনো দায়িত্ব নেই। কিন্তু মোহরানা নির্ধারিত হলে এবং স্পর্শ করার আগে তালাক দেওয়ার উপক্রম হলে নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক আদায় করতে হবে; যদি না নারী নিজের ইচ্ছায় পুরোটা ছেড়ে দেয় অথবা পুরুষ পুরোটা আদায় করে।

তৃতীয়ত, স্ত্রীকে জীবনযাপনের কিছু আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় করা। কুরআন এটাকে আল্লাহভীরু এবং ইহসান অবলম্বনকারীদের ওপর একটি হক বা অধিকার হিসেবে গণ্য করেছে। এর পরিমাণ সমাজের রীতি এবং পুরুষের আর্থিক অবস্থার নিরিখে নির্ধারিত হবে। তালাক যদি নারীকে স্পর্শ না করে বা মোহরানা নির্ধারণ না করে দেওয়া হয়, তবুও আল্লাহতায়ালার ইরশাদ হলো: এই হক আদায় করা উচিত।

৪. *ইদ্দত* চলাকালীন স্বামী যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে নারী যথারীতি তার স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে। তালাক এবং তালাকের পর প্রত্যাবর্তনের এই অধিকার প্রতিটি ব্যক্তির জন্য একটি বিবাহের সম্পর্কে দুইবার পর্যন্ত রয়েছে। এর পরে এই অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং একটি বিবাহের সম্পর্কে দুইবার প্রত্যাবর্তনের পর তৃতীয়বার আবার যদি বিচ্ছেদের উপক্রম হয় এবং স্বামী তালাক দেয়, তবে এর ফলে নারী চিরতরে তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে; যদি না অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হয় এবং সেও তাকে তালাক দেয়।

৫. স্বামী তালাক দিক বা প্রত্যাবর্তন করুক — উভয় ক্ষেত্রেই তার উচিত নিজের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দুইজন বিশ্বস্ত মুসলমানকে সাক্ষী রাখা। এর উদ্দেশ্য: দুই পক্ষের কেউ যেন পরবর্তীতে কোনো কথা অস্বীকার করতে না পারে এবং যদি কোনো বিবাদ সৃষ্টি হয়, তবে তার ফয়সালা যেন সহজে হয়।

৬. তালাকের *ইদ্দত* সাধারণ অবস্থায় তিন ঋতুকাল এবং গর্ভবতী হওয়ার ক্ষেত্রে সন্তান প্রসব পর্যন্ত। নারী যদি ঋতুস্রাব থেকে নিরাশ হয় অথবা ঋতুর বয়সে পৌঁছানো সত্ত্বেও তার ঋতুস্রাব না হয়, তবে এই *ইদ্দত* তিন মাস হবে। নারী যদি অস্পর্শিতা হয় [*অর্থাৎ যার সাথে সহবাস করা হয়নি*], তবে তার যেহেতু গর্ভধারণের প্রশ্নই ওঠে না, তাই তার কোনো *ইদ্দতও* নেই।

ইদ্দতের সময়কাল সম্পর্কিত যে বিধানগুলো কুরআনে বলা হয়েছে, তা হলো:

প্রথমত, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এ সময়ে না স্ত্রী নিজের ঘর ছাড়বে এবং না স্বামীর অধিকার আছে যে, সে তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে। এভাবে একত্রে থাকার ফলে প্রত্যাশা করা যায় যে, অন্তরে পরিবর্তন আসবে, উভয়ে নিজেদের আচরণ পর্যালোচনা করবে এবং তাদের ভেঙে যাওয়া ঘর পুনরায় শান্ত হবে। ঐ অবস্থা এর ব্যতিক্রম, যখন পুরুষ নারীকে কোনো প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে তালাক দেয়। এই অবস্থায় স্পষ্টত স্বামীর কাছে এমন দাবি করা বৈধ নয় যে, সে এমন নারীকে ঘরে রাখবে। আর যে উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা-ও এ ক্ষেত্রে অর্জিত হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, বলা হয়েছে যে, *ইদ্দত* চলাকালীন সময়ে সে নারীকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাসের জায়গা এবং ভরণপোষণ প্রদান করবে এবং এই সময়ে এমন কোনো পথ অবলম্বন করবে না যাতে তার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং সে কয়েক দিনের মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে তার ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়।

তৃতীয়ত, *ইদ্দতের* সময়ে নারী নিজের গর্ভ গোপন করার চেষ্টা করবে না। আল্লাহতায়ালা অত্যন্ত কঠোরভাবে এ বিষয়ের

তাগিদ দিয়েছেন; কারণ *ইদ্দতের* হুকুম দেওয়াই হয়েছে এ জন্য যে, নারী গর্ভবতী কি না — তার ফয়সালা হয়।

৭. তালাকের পরেও যদি তালাকদাতা স্বামী চায় যে, নারী তার শিশুকে দুধ পান করাবে, তবে তার উচিত দুই বছর পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করা। নারী এর জন্য রাজি থাকলে পুরুষ তাকে এই সেবার পারিশ্রমিক প্রদান করবে এবং এই পারিশ্রমিক পারস্পরিক পরামর্শে ও উত্তম পন্থায় নির্ধারিত হবে। শিশুর পিতা মৃত্যুবরণ করলে উল্লিখিত দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রে তার উত্তরাধিকারীর অবস্থানও ঠিক তাই হবে। দুই পক্ষ এই মেয়াদ কমও করতে পারে এবং শিশুর পিতা বা তার উত্তরাধিকারী মায়ের বদলে অন্য কোনো নারীকে দিয়ে দুধ পান করাতে চাইলে তারও অনুমতি আছে — তবে শর্ত এই যে, যদি শিশুর মায়ের সাথে পাওনা পরিশোধের যে চুক্তি হয়েছে, তা পূর্ণ করা হয়।

৮. তালাকের পর নারীর কোনো সিদ্ধান্তে বাধা দেওয়ার অধিকার পূর্বের স্বামীর আর থাকে না। নারী যখন চাইবে এবং যেখানে চাইবে বিয়ে করতে পারে। তার এই সিদ্ধান্ত যদি সামাজিক রীতি অনুযায়ী হয়, তবে এতে কোনো আপত্তির অবকাশ থাকতে পারে না।

স্বামীর মৃত্যু

বিধবার *ইদ্দত* চার মাস দশ দিন। সাধারণ তালাকপ্রাপ্ত নারীর তুলনায় এই বৃদ্ধি এ কারণে হয়েছে যে, তাকে এমন পবিত্র অবস্থায় তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে স্বামীর সাথে তার মিলন

হয়নি; কিন্তু বিধবার জন্য এ ধরনের কোনো নিয়ম বানানো যেহেতু সম্ভব নয়, তাই সতর্কতার দাবি ছিল যে, দিন বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবার জন্য *ইদ্দতের* বিধান যেহেতু একই উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে, তাই তালাকের ক্ষেত্রে যেসব ব্যতিক্রমের কথা বর্ণিত হয়েছে, বিধবার *ইদ্দতের* ক্ষেত্রেও সেগুলো একইভাবে গণ্য হবে। সুতরাং অস্পর্শিতা [*অর্থাৎ অবিবাহিত অবস্থায় স্বামী মারা যাওয়া*] বিধবার জন্য কোনো *ইদ্দত* থাকবে না এবং গর্ভবতী বিধবার *ইদ্দত* সন্তান প্রসবের পর শেষ হবে।

ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর নারী স্বাধীন এবং নিজের বিষয়ে যে পদক্ষেপ উপযুক্ত মনে করবে, তা গ্রহণ করতে পারে। তবে সমাজের রীতিনীতি মানা তার উচিত — অর্থাৎ এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যাতে পরিবারগুলোর ইজ্জত, খ্যাতি, মর্যাদা এবং ভালো রেওয়াজ-রীতির ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এটা খেয়াল রাখা হলে তার বা তার অভিভাবকদের ব্যাপারে কোনো দোষারোপ করা যায় না।

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিধবাকে বিবাহ করতে চায়, তবে *ইদ্দত* চলাকালীন সময়ে সে এতটুকু করতে পারে যে, নিজের মনে এই ইচ্ছা স্থির করবে বা ইশারা-ইঙ্গিতে মুখে কোনো কথা বলবে; কিন্তু তার জন্য কখনো বৈধ নয় যে, কোনো শোকাহত পরিবারের আবেগের খেয়াল না রেখে নারীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাবে অথবা কোনো গোপন অঙ্গীকার করবে।

স্বামীদের জন্য জরুরি যে, তারা তাদের বিধবা স্ত্রীদের জন্য এক বছরের ভরণপোষণ এবং নিজেদের ঘরে বসবাসের ওসিয়ত করে যাবেন; যদি না তারা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছায় স্বামীর ঘর ছেড়ে দেয় বা এই জাতীয় অন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়।

নারী ও পুরুষের মেলামেশা

বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্তরের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য আল্লাহতায়ালা নারী ও পুরুষের মেলামেশার কিছু আদব বা শিষ্টাচার নির্ধারণ করেছেন। এই আদবগুলো নিম্নরূপ:

১. একে অপরের বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে হুট করে এবং অনুমতি ছাড়া ভিতরে প্রবেশ করা জায়েজ নয়। এ ধরনের অবস্থায় জরুরি হচ্ছে, ব্যক্তি প্রথমে ঘরের লোকদের কাছে নিজের পরিচয় দেবে; যার মার্জিত ও ভদ্রোচিত পদ্ধতি হলো: দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া। এতে ঘরের লোকেরা জানতে পারবে যে, আগন্তুক কে, সে কী চায় এবং তার ঘরে প্রবেশ করা সমীচীন কি না। এরপর তারা যদি সালামের উত্তর দেয় এবং অনুমতি মেলে, তবেই ঘরে প্রবেশ করবে। অনুমতি দেওয়ার মতো ঘরে কেউ না থাকলে, অথবা কেউ থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয় যে, এই মুহূর্তে দেখা করা সম্ভব নয়, তবে মনে কোনো সংকীর্ণতা অনুভব না করে ফিরে যাবে।

এর উদ্দেশ্য আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করা বা তাদের সামাজিক স্বাধীনতায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা নয়। তাই মানুষ নিজে হোক বা তাদের অসহায় ও অক্ষম আত্মীয়-পরিজন, যারা তাদের বাড়িতে চলাফেরা করে, তাদের জন্য একে অপরের বাড়িতে আসা-যাওয়া, দেখা-সাক্ষাৎ এবং নারী-পুরুষের আলাদাভাবে বা একত্রে বসে পানাহার করায় কোনো বাধা নেই। না তাদের নিজেদের ঘরে কোনো বাধা আছে, না বাপ-দাদার ঘরে, না মায়েদের ঘরে, না

ভাই ও বোনদের ঘরে, না চাচা, ফুফু, মামা ও খালাদের ঘরে, না তত্ত্বাবধানাধীন ব্যক্তিদের ঘরে এবং না বন্ধুদের ঘরে। তবে এতটুকু জরুরি যে, ঘরে প্রবেশের সময় আপনজনদের সালাম করবে।

২. যেসব জায়গায় মানুষের স্ত্রী-সন্তান বসবাস করে না, সেসব স্থানের জন্য এই বিধিনিষেধ জরুরি নয়। অর্থাৎ হোটেল, সরাইখানা, মেহমানখানা, দোকান, অফিস, বৈঠকখানা ইত্যাদি। একইভাবে বাড়িতে যাতায়াতকারী খাদেম এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের জন্য সবসময় অনুমতি নেওয়া জরুরি নয়। তাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তারা তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে:

- ফজর নামাজের আগে, যখন মানুষ বিছানায় থাকে।
- জোহরের সময়, যখন তারা বিশ্রামের জন্য পোশাক খুলে রাখে এবং
- এশার পর, যখন তারা ঘুমানোর জন্য বিছানায় চলে যায়।

এগুলো ছাড়া অন্য সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু এবং ঘরের খাদেমরা নারী ও পুরুষদের কাছে তাদের একান্ত যাপনের জায়গায় এবং তাদের কামরায় অনুমতি ছাড়া আসতে পারে। তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এই সুযোগ আর থাকবে না। সাবালক হওয়ার পর তাদের জন্যও জরুরি হবে যে, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করা।

৩. এসব স্থানে যদি নারীরা উপস্থিত থাকে, তবে আল্লাহর হুকুম হচ্ছে: পুরুষরাও যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নারীরাও [*যেন দৃষ্টি সংযত রাখে*]। দৃষ্টিতে লজ্জা থাকবে এবং পুরুষ-নারী একে অপরের রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করা, অবয়ব পর্যবেক্ষণ করা এবং একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকা থেকে বিরত থাকবে — তবেই এই হুকুমের উদ্দেশ্য নিশ্চয় পূর্ণ হবে। কারণ, এর লক্ষ্য না-তাকানো বা সবসময় নিচের দিকে তাকিয়ে থাকা নয়, বরং লোলুপ দৃষ্টিতে না তাকানো এবং দৃষ্টিকে দেখার জন্য একেবারে অবাধ ছেড়ে না দেওয়া।

৪. এ ধরনের ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে হবে। এর অর্থ হলো — না সেগুলোর প্রতি অন্যদের কোনো আসক্তি থাকবে, আর না সেগুলো অন্যদের সামনে উন্মুক্ত করা হবে। বরং নারী ও পুরুষ এক জায়গায় উপস্থিত থাকলে গোপনাঙ্গগুলো আরও বেশি গুরুত্বের সাথে ঢেকে রাখতে হবে। এতে স্পষ্টতই বড় ভূমিকা পালন করে পোশাকের পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতা। নারী ও পুরুষ উভয়েই এমন পোশাক পরবে, যা সৌন্দর্যের সাথে সাথে গোপনাঙ্গগুলোকেও পুরোপুরি আবৃত করে। এরপর সাক্ষাতের সময় এই খেয়াল রাখতে হবে যে, ওঠা-বসায় কোনো ব্যক্তি যেন উলঙ্গ না হয়।

৫. নারীদের জন্য বিশেষভাবে জরুরি যে, তারা সাজসজ্জার কোনো কিছু নিজেদের *মাহরাম* আত্মীয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সামনে প্রকাশ করবে না। তবে সৌন্দর্যের ঐসব বিষয় এর ব্যতিক্রম, যা সাধারণত প্রকাশ থাকে; অর্থাৎ হাত-পা এবং চেহারার সাজগোজ ও অলংকার ইত্যাদি। এই অঙ্গগুলো ছাড়া বাকি সব জায়গার সৌন্দর্য নারীদের ঢেকে রাখা উচিত; এমনকি পুরুষদের উপস্থিতিতে নিজের পা

জমিনে জোরে আঘাত করে হাঁটা থেকেও বিরত থাকা উচিত — যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ না হয়।

৬. নারীর বুক যেহেতু সংবেদনশীল অঙ্গ, আবার গলায় অলংকারও থাকে, তাই এ ধরনের ক্ষেত্রে একে ওড়না দিয়ে ঢেকে নেওয়া উচিত। বুক ও গ্রীবা ঢেকে রাখার এই হুকুম সেই বৃদ্ধাদের জন্য নয়, যারা আর বিবাহের আশা রাখে না; শর্ত হলো: তারা যেন সৌন্দর্য প্রদর্শনকারিণী না হয়। তবুও তাদের জন্যও পছন্দনীয় বিষয় হলো: সতর্কতা অবলম্বন করা এবং পুরুষদের উপস্থিতিতে ওড়না না খোলা। এটাই তাদের জন্য উত্তম।

পিতামাতা

বিবাহের মাধ্যমে যে সম্পর্কগুলো তৈরি হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো পিতামাতার। তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের শিক্ষা সকল আসমানি কিতাবে দেওয়া হয়েছে। এর যেসব সীমা কুরআন নির্ধারণ করেছে, তা নিম্নরূপ:

১. নিজের প্রতিপালকের পর মানুষের উচিত সবচেয়ে বেশি নিজের মা-বাবার কৃতজ্ঞ হওয়া। এই কৃতজ্ঞতা কেবল মুখে আদায়ের বিষয় নয়, এর আবশ্যিক দাবি হলো: ব্যক্তি তাদের সাথে অত্যন্ত সম্মানের সাথে আচরণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে মনে কোনো অসন্তোষ দানা বাধতে দেবে না, তাদের সামনে বেয়াদবিমূলক কোনো কথা মুখ দিয়ে বের করবে না, বরং কোমলতা, ভালোবাসা, উদারতা ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে। তাদের কথা মেনে চলবে এবং বার্ধক্যের অসহায়ত্বে তাদের প্রতি মমতা ও সান্ত্বনা প্রদান করবে।

২. পিতামাতার এই মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও এই অধিকার তাদের নেই যে, তারা কাউকে আল্লাহতায়ালার শরিক করার জন্য সন্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। এই বিষয়ে সন্তানদের উচিত তাদের আনুগত্য স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা এবং সর্বাবস্থায় সেসব মানুষের পথ অনুসরণ করা, যারা খোদাতায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। খোদাতায়ালা থেকে বিমুখ হওয়ার দাওয়াত পিতামাতা দিলেও তা গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহতায়ালার অন্যান্য আদেশ ও নির্দেশও এর অধীনেই গণ্য হবে এবং পিতামাতার কথায় সেগুলোর লঙ্ঘন করা কারও জন্য জায়েজ হবে না।

৩. শিরকের মতো গুনাহতে অটল থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার বিষয়ে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নীতি প্রথা অনুযায়ী একইভাবে বজায় রাখতে হবে। তাদের প্রয়োজন যথাসাধ্য পূরণের চেষ্টা করতে হবে এবং তাদের জন্য হেদায়েতের দোয়াও সমানভাবে জারি রাখতে হবে। ধর্ম ও শরিয়তের বিষয় আলাদা; কিন্তু এ জাতীয় বিষয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে কোনোভাবেই কোনো ত্রুটি হওয়া উচিত নয়।

এতিম

শিশুরা যদি পিতৃহীন হয়, তবে তাদের বিষয়াবলী নিয়ে কুরআন কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। এগুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

১. এতিমদের অভিভাবকরা তাদের সম্পদ তাদের হাতে তুলে দেবে, তা নিজেরা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করবে না। অন্যায় ও অবিচারের মাধ্যমে এতিমের সম্পদ গ্রাস করা মানে নিজের পেটে আগুন ভরা। তাই কোনো ব্যক্তি যেন নিজের খারাপ মাল

এতিমদের ভালো মালের সাথে বদলে নেওয়ার চেষ্টা না করে এবং প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে সেটাকে নিজের মালের সাথে মিশিয়ে খাওয়ার সুযোগ তৈরি না করে। এ ধরনের সংমিশ্রণ যদি কখনো করা হয়, তবে তা আত্মসাতের জন্য নয় বরং তাদের কল্যাণ ও তাদের বিষয়াদি সংশোধনের জন্য হওয়া উচিত।

২. এতিমদের মালের হেফাজত এবং তাদের অধিকার রক্ষা করা একটি বড় দায়িত্ব। মানুষের জন্য একা এই দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয় এবং তারা যদি মনে করে যে, এতিমের মাকে এটার সাথে যুক্ত করে তারা নিজেদের জন্য সুবিধা তৈরি করতে পারবে — তবে তাদের উচিত তাদের মায়েদের মধ্য থেকে যারা তাদের জন্য বৈধ, তাদের মধ্য থেকে দুই, তিন বা চারজনকে বিবাহ করা। কিন্তু এই অনুমতি কেবল তখনই, যখন স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ বজায় রাখা সম্ভব হবে। যদি এই আশঙ্কা থাকে যে, তারা এতে সফল হবে না, তবে এতিমদের কল্যাণের মতো নেক উদ্দেশ্যের কারণেও একের অধিক বিবাহ করবে না। ইনসাফের ওপর অটল থাকার জন্য এই পদ্ধতিই অধিক সঠিক। এর সাথে এটাও জরুরি যে, এই নারীদের মোহরানা সেই পদ্ধতিতেই দিতে হবে, যেভাবে সাধারণ নারীদের দেওয়া হয়। এই অজুহাত দেখানো যাবে না যে, বিবাহ যেহেতু তাদেরই সন্তানের উপকারে করা হয়েছে, তাই এখন আর কোনো দায়িত্ব অবশিষ্ট নেই। হ্যাঁ, যদি তারা নিজেদের খুশিতে মোহরানার কোনো অংশ মাফ করে দেয়, বা অন্য কোনো ছাড় দেয়, তবে তাতে অসুবিধা নেই। মানুষ চাইলে তা গ্রহণ করতে পারে।

৩. এতিমদের মাল তাদের হাতে বুঝিয়ে দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা তখনই কার্যকর করা হবে, যখন তারা নিজেদের মাল সামলে নেওয়ার বয়সে পৌঁছাবে। এর আগে জরুরি হলো যে, এটা অভিভাবকদের হেফাজত ও নজরদারিতে থাকবে এবং তারা এতিমদের যাচাই করতে থাকবে — তাদের মধ্যে বিষয়গুলো বোঝার বোধ-বুদ্ধি এবং নিজের দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা তৈরি হচ্ছে কি না। এই সময়ে তাদের প্রয়োজনগুলো অবশ্য সচ্ছলতার সাথে পূরণ করা হবে। তারা বড় হবে — এই আশঙ্কায় তাদের মাল দ্রুত উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে না; এবং কথাবার্তায় তাদের প্রতি মমতা ও সান্ত্বনার বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

৪. অভিভাবক যদি সচ্ছল হয়, তবে নিজের এই সেবার বিনিময়ে তার কিছু নেওয়া উচিত নয়; কিন্তু গরিব হলে এতিমের মাল থেকে নিজের সেবার পারিশ্রমিকের নিয়ম অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারে।

৫. মাল বুঝিয়ে দেওয়ার সময় কিছু বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখা উচিত — যাতে কোনো কুধারণা এবং মতভেদ বা বিবাদের সম্ভাবনা না থাকে। এরপর মনে রাখা উচিত যে, একদিন এই হিসাব আল্লাহতায়ালার কাছেও দিতে হবে এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ, তাঁর থেকে কোনো কিছু গোপন করা যায় না।

৬. মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে *ওয়ারিসদের* অংশ যদিও নির্ধারিত, কিন্তু উত্তরাধিকার বণ্টনের সময় নিকটাত্মীয় এবং এতিম ও মিসকিনরা উপস্থিত হলে — আইনি দিক থেকে তাদের কোনো অধিকার আছে কি না, তা বিবেচনা না করেই

— তাদের কিছু দিয়ে এবং ভালো কথা বলে বিদায় করতে হবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের মনে রাখা উচিত যে, তার সন্তানরাও এতিম হতে পারে এবং সেও একইভাবে তাদেরকে অন্যদের করুণার মুখাপেক্ষী রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারে।

৩. রাজনীতির বিধি-বিধান

মানুষকে আল্লাহতায়ালা যে *ফিতরাতের* ওপর সৃষ্টি করেছেন, তার একটা অনিবার্য পরিণতি এটাও যে, সে সভ্যতা চায় এবং তারপর এই সভ্যতাকে নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার অপব্যবহার থেকে বাঁচানোর জন্য অবিলম্বে হোক বা বিলম্বে নিজের মধ্যে একটি সামাজিক শৃঙ্খলা তৈরি করতে বাধ্য হয়। মানব ইতিহাসে রাজনীতি ও সরকার, মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা ও এই বাধ্যবাধকতার গর্ভ থেকেই জন্ম নিয়েছে এবং মানুষ যতক্ষণ মানুষ আছে, ততক্ষণ সে চাইলেও এখান থেকে নিষ্কৃতি লাভে সফল হতে পারবে না। তাই বুদ্ধি-বিবেকের দাবি এটাই যে, এই দুনিয়ায় রাষ্ট্রহীন কোনো সমাজ ও সভ্যতার স্বপ্ন দেখার পরিবর্তে মানুষের উচিত নিজের জন্য এমন একটি সামাজিক চুক্তি অস্তিত্বে আনার চেষ্টা করা, যা সামাজিক ব্যবস্থাকে পরিশুদ্ধ করে তার জন্য একটি ন্যায়নিষ্ঠ সরকারের ভিত্তি প্রদান করবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষের *ফিতরাত* তাকে সাধারণভাবে এই পথ দেখিয়েছে এবং এই পথেই সংগ্রামের জন্য তাকে প্রস্তুত করেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত যে ফলাফল এসেছে এবং যা প্রত্যেকে এই জগতে নিজ চোখে দেখতে পারে — শুধু সেটাই এই বাস্তবতাকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, জীবনের অন্যসব বিষয়ের মতো মানুষের বুদ্ধি-বিবেকের পক্ষেও এই বিষয়ে আসমানি হেদায়েত ছাড়া

কিছু মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে নেয়া সম্ভব নয়। আল্লাহতায়ালা এই ভিত্তিতেই রাজনীতির বিধি-বিধান মুসলমানদের দিয়েছেন। এটা নিম্নোক্ত পাঁচটি দফার ওপর ভিত্তিশীল:

১. মৌলিক নীতি

আল্লাহ ও রাসুল যেসব বিষয়ে কোনো হুকুম সকল সময়ের জন্য দিয়েছেন, সেগুলোতে মুসলমানদের 'উলিল আমর' — চাই তারা রাষ্ট্রপ্রধান হন বা পার্লামেন্টের সদস্য — নিজের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। ফলে মুসলমানরা তাদের রাষ্ট্রে এমন কোনো আইন তৈরি করতে পারবে না, যা আল্লাহ ও রাসুলের হুকুমের পরিপন্থী হয় বা যাতে তাঁদের হেদায়েতকে উপেক্ষা করা হয়। তবে এর অধীনে তারা অবশ্য বাধ্য যে, 'উলিল আমর'-এর পক্ষ থেকে যে হুকুমই দেওয়া হবে, তা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং মানবে।

২. আসল দায়িত্ব

এই নীতির ভিত্তিতে যে সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, তার আসল দায়িত্ব হচ্ছে: জাতির আমানতসমূহ যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের কাছে সোপর্দ করা এবং আদল ও ইনসাফকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং ন্যায়বিচারকে তার চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখা।

৩. ধর্মীয় ফরজসমূহ

নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, ভালোর উপদেশ দেওয়া এবং মন্দ থেকে বিরত রাখা — এগুলো সামাজিক ব্যবস্থার জন্য ধর্মীয় ফরজ। এগুলো পূরণ করার জন্য যে হেদায়েত কুরআন ও সুন্নাতে দেওয়া হয়েছে, তার আলোকে:

ক. রাষ্ট্রের মুসলমান নাগরিকদের থেকে দাবি করা হবে যে, নিজেদের ইমান ও ইসলামের সাক্ষ্য হিসেবে নামাজ কায়েম করবে।

খ. জুমার নামাজের খুতবা এবং তার ইমামতি রাষ্ট্রের রাজধানীর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে রাষ্ট্রপ্রধান, প্রদেশগুলোতে গভর্নর এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটে তাদের কর্মচারীগণ করবেন।

গ. প্রত্যেক মুসলমান, যার ওপর যাকাত ধার্য হয়েছে, সে নিজের সম্পদ, গবাদিপশু এবং উৎপাদিত ফসলে নির্ধারিত অংশ নিজের মূলধন থেকে আলাদা করে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারের কাছে হস্তান্তর করবে; এবং সরকার অন্যান্য খাতের সঙ্গে প্রাপ্ত যাকাত থেকে নিজের অভাবী নাগরিকদের প্রয়োজনসমূহ — তাদের ফরিয়াদের আগেই — তাদের দরজায় পৌঁছে পূরণ করার চেষ্টা করবে।

ঘ. ভালোর উপদেশ দেওয়া এবং মন্দ থেকে বিরত রাখার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কিছু লোক নিয়মিতভাবে নিয়োগ করা হবে, যারা নিজেদের জন্য নির্ধারিত সীমানা অনুযায়ী এই কাজ সম্পন্ন করতে সবসময় সক্রিয় থাকবে।

৪. নাগরিকত্বের অধিকার

রাষ্ট্রের মুসলমান নাগরিকরা যদি নামাজের ব্যবস্থা করে এবং যাকাত আদায় করতে থাকে, তবে তারা সেসব অধিকার লাভ করবে, যা একজন মুসলমান হিসেবে তাদের রাষ্ট্রে তাদের পাওয়া উচিত। তারা পরস্পরের ভাই হবে, আইনি অধিকারসমূহের দিক থেকে সমান হবে। ধর্মের ইতিবাচক দাবিগুলোর মধ্যে নামাজ ও যাকাত ছাড়া অন্য কিছু

আইনের শক্তি দিয়ে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না; এবং রাষ্ট্র তাদের জান, মাল, ইজ্জত এবং বুদ্ধি-বিবেক ও মতের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের কোনো জবরদস্তি করতে পারবে না।

৫. শাসনব্যবস্থা

রাষ্ট্রের *আমির* (রাষ্ট্রপ্রধান) ও শাসক নির্বাচন এবং সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনা মানুষের রায় ও পরামর্শের মাধ্যমে হবে এবং ক্ষমতা গ্রহণের পরেও তাদের এই অধিকার থাকবে না যে, সামষ্টিক বিষয়ে তারা মুসলমানদের ঐকমত্য বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে উপেক্ষা করবে।

৪. অর্থনীতির বিধি-বিধান

অর্থনীতির পরিশুদ্ধির যে বিধি-বিধান আল্লাহতায়ালা তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে মানবজাতিকে দিয়েছেন, তার ভিত্তি এই মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহতায়ালা এই দুনিয়াকে পরীক্ষার জন্য তৈরি করেছেন। এই কারণে দুনিয়ার ব্যবস্থা তিনি এমনভাবে কায়েম করেছেন যে, এখানে সব মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী এবং সাহায্যপ্রার্থী হিসেবে পয়দা হয়েছে। এই দুনিয়ায় উচ্চ থেকে উচ্চতর ব্যক্তিত্বও নিজের প্রয়োজনে অন্যের প্রতি দ্বারস্থ হওয়ার মুখাপেক্ষী এবং নিম্ন থেকে নিম্নতর মানুষের দিকেও এসব প্রয়োজনের জন্য দ্বারস্থ হতে হয়। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি ভূমিকা রয়েছে এবং কেউই অন্যকে ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। জগতের প্রতিপালক এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির মেধা, যোগ্যতা, রুচি ও প্রবণতা এবং উপায়-উপকরণ ও সম্পদে বড় ব্যবধান রেখেছেন। ফলে এই ব্যবধানের পরিণতিতে যে সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে, তাতে একদিকে যেমন সেই আলেম ও *হাকিম* (প্রজ্ঞাবান) ব্যক্তির জন্ম হয়, যাদের জ্ঞান থেকে দুনিয়া আলো গ্রহণ করে; সেই লেখক পয়দা হয়, যাদের কলম শব্দ ও অর্থের সম্পর্ককে চিরস্থায়ী জীবন দেয়; সেই গবেষক জন্ম নেয়, যাদের গবেষণার অভিনবত্বে যুগ প্রশংসা করে; সেই নেতা পয়দা হয়, যাদের রণকৌশল ও রাজনীতিতে সামষ্টিক জীবনের জটিলতা খুলে যায়; সেই সংস্কারক জন্ম নেয়, যাদের চেষ্টা ও সাধনায় মানবতা স্বয়ং নিজের

চেতনা লাভ করে; এবং সেই শাসক পয়দা হয়, যাদের দৃঢ় সংকল্প ও স্থিতি ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। অন্যদিকে সেই শ্রমিক ও কৃষক এবং সেই খাদেম, কুলি ও ঝাড়ুদারও পয়দা হয়, যাদের মেহনতে কলকব্জা বিস্ময় দেখায়, মাটি সোনা ফলায়, চুলা স্বাদ ও রসনার সরঞ্জাম তৈরি করে, ঘর-বাড়ি রুপার মতো ঝকঝক করে, রাস্তা পা রাখার জন্য ব্যাকুল থাকে, অট্টালিকা-ইমরাত আসমানের খবর নিয়ে আসে এবং আবর্জনাগুলো ভোরবেলা নিজের বিছানা গুটিয়ে নেয়।

স্তরভেদের এই পার্থক্যসহ দুনিয়াকে সৃষ্টি করে জগতের প্রতিপালক এটা দেখছেন যে, এই উচ্চ ও নিম্নরা পারস্পরিক সম্মান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সৎ সমাজব্যবস্থা ও সৎ সভ্যতা গড়ে তোলে, নাকি একে অপরের বিরুদ্ধে নিজেদের অশুভ তৎপরতা ও নির্বুদ্ধিতা দিয়ে এই জগতকে পুরোপুরি ফাসাদে পরিণত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়; আর এভাবে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয় এবং আখিরাতেও তাঁর শাস্তির যোগ্য সাব্যস্ত হয়।

মানুষের জন্য এটাই সেই পরীক্ষা, যাতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীদের মাধ্যমে তাকে হেদায়েত দিয়েছেন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতার জন্য তাকে নিজের বিধি-বিধান দিয়েছেন।

এই বিধি-বিধান নিম্নরূপ:

১. মালিকানার পবিত্রতা

মুসলমান যাকাত আদায় করলে তাদের সেই সম্পদ, যা তারা বৈধ উপায়ে মালিক হয়েছে, আল্লাহ ও রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত কোনো হক ছাড়া তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। এমনকি তাদের রাষ্ট্র এই যাকাত ছাড়া নিজের

মুসলমান নাগরিকদের ওপর তাদের সম্মতি ব্যতীত কোনো প্রকারের কোনো ট্যাক্স বা করও আরোপ করতে পারে না।

২. জাতীয় সম্পদ

সে সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তি কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন নয় বা হতে পারে না, সেগুলো রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকা উচিত, যাতে জাতির এই সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয় এবং এর উপকার তারা-ও গ্রহণ করতে পারে, যারা নিজেদের প্রয়োজনে অন্যদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। একইভাবে সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত আরও কিছু দায়িত্বও এর মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে।

৩. অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ

অন্যের সম্পদ বাতিল পন্থায় খাওয়া নিষিদ্ধ। সুদ ও জুয়া এই সিলসিলা বা ধারাবাহিকতার নিকৃষ্টতম অপরাধ। এগুলো ছাড়া অন্যান্য সব অর্থনৈতিক লেনদেনের বৈধতা ও অবৈধতার ফয়সালাও এই মূলনীতির আলোকেই করা উচিত।

৪. লিখন ও সাক্ষ্য

লেনদেন, ঋণ, ওসিয়ত এবং এ ধরনের অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে লিখন ও সাক্ষ্যের ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক। এ ব্যাপারে উদাসীনতা অনেক সময় বড় নৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে ওঠে।

এর বিধানগুলো হচ্ছে:

- ঋণের লেনদেন একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হলে জরুরি যে, তার দলিল-দস্তাবেজ লিখে রাখা হবে।

- এই দলিল উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে কোনো লেখক ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে লিখবে।

- দলিল লেখানোর দায়িত্ব ঋণ গ্রহণকারীর ওপর ন্যস্ত হবে। সে দলিলে স্বীকার করবে যে, আমি অমুকের পুত্র অমুকের এত টাকার ঋণী।

- যদি এই ব্যক্তি কম বুদ্ধিসম্পন্ন বা দুর্বল হয়, অথবা দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি লেখানোর যোগ্যতা না রাখে, তবে তার অভিভাবক বা উকিল সততা ও ইনসাফের সাথে এই দলিল লিখে নেবে।

- এর ওপর দুইজন মুসলমান পুরুষের সাক্ষ্য সাব্যস্ত করা হবে, যারা পরিচিত ও ঘনিষ্ঠজনদের অন্তর্ভুক্ত এবং পছন্দনীয় চরিত্র ও আমলের, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও ইমানদার হয়।

- যদি উল্লিখিত গুণের দুইজন পুরুষ পাওয়া না যায়, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন নারী নির্বাচন করা যেতে পারে। দুইজন নারীর শর্ত এজন্য যে, ঘরে থাকা এই নারী যদি আদালতের পরিবেশে ঘাবড়ে যায়, তবে সাক্ষ্যকে অস্পষ্টতা ও অস্থিরতা থেকে বাঁচাতে আরেকজন নারী সহায়ক হয়ে উঠবে।

- যারা কোনো দলিল-দস্তাবেজের সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ে তাদের উচিত নয় সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকা।

- হাতে হাতে লেনদেনের জন্য লিখন ও দলিল-দস্তাবেজের বাধ্যবাধকতা নেই। হ্যাঁ, যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো ক্রয়-বিক্রয়

হয়, তবে তার সাক্ষী রাখা উচিত, যাতে কোনো বিবাদের সৃষ্টি হলে তার নিষ্পত্তি করা যায়।

- বিবাদ সৃষ্টির অবস্থায় লেখক বা সাক্ষীকে ক্ষতি করার চেষ্টা কোনো পক্ষের জন্য জায়েজ নয়।

- ব্যক্তি যদি সফরে থাকে এবং কোনো লেখক পাওয়া না যায়, তবে ঋণের বিষয়টি বন্ধক দেওয়ার মাধ্যমেও হতে পারে। বন্ধকের অনুমতি ততক্ষণই আছে, যতক্ষণ ঋণদাতার জন্য নিশ্চিন্ত হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি না হয়। এই অবস্থা সৃষ্টি হলে ঋণের ব্যাপারে সাক্ষ্য নির্ধারণ করে বন্ধক রাখা জিনিস অবশ্যই ফেরত দিতে হবে।

- কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং নিজের সম্পদ সম্পর্কে তাকে কোনো ওসিয়ত করতে হয়, তবে নিজের মুসলমান ভাইদের মধ্য থেকে দুইজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিজের এই ওসিয়তের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা উচিত।

- মৃত্যুর এই পর্যায় যদি কারও সফরে উপস্থিত হয় এবং সাক্ষী বানানোর জন্য সেখানে দুইজন মুসলমান পাওয়া না যায়, তবে বাধ্যগত অবস্থায় সে দুইজন অমুসলিমকেও সাক্ষী বানাতে পারে।

- সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে যে দুজনকে নির্বাচন করা হবে, তাদের ব্যাপারে যদি এই আশঙ্কা হয় যে — কারও পক্ষ নিতে গিয়ে তারা সাক্ষ্যে কোনো রদবদল করবে, তবে তা রোধ করার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে যে, কোনো নামাজের পর তাদের মসজিদে অপেক্ষা করতে বলা হবে এবং আল্লাহর নামে তাদের থেকে এই মর্মে কসম নেওয়া হবে যে — নিজেদের কোনো পার্থিব লাভের

জন্য বা কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে তারা সাক্ষ্যে কোনো পরিবর্তন করবে না, এমনকি সে ব্যক্তি তাদের নিকটাত্মীয় হলেও; আর যদি তারা এমনটি করে, তবে তারা গুনাহগার সাব্যস্ত হবে।

- সাক্ষীদের জানা উচিত যে, এই সাক্ষ্য খোদার সাক্ষ্য, সুতরাং এতে সামান্য খেয়ানতও যদি তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়, তবে তারা শুধু বান্দার নয়, বরং খোদাতায়ালার নিকটেও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য হবে।

- এমনটি সত্ত্বেও যদি এই কথা জানা যায় যে, সাক্ষীরা ওসিয়তকারীর ওসিয়তের বিরুদ্ধে কারো পক্ষে পক্ষাবলম্বন করেছে বা কারো হক নষ্ট করেছে, তবে যাদের হক নষ্ট হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে দুইজন লোক দাঁড়িয়ে কসম খাবে যে, 'আমরা এই সাক্ষীদের চেয়ে বেশি সত্যবাদী। আমরা এই বিষয়ে হক থেকে কোনো সীমালঙ্ঘন করিনি এবং আমরা পূর্ণ দায়িত্বের সাথে এটা বলছি যে, যদি আমরা এমনটি করে থাকি, তবে খোদার দরবারে জালেম হিসেবে গণ্য হব।'

- সাক্ষীদের ব্যাপারে এই অতিরিক্ত জবাবদিহিতার সুফল এই যে, এর ফলে তারা যথাযথভাবে সাক্ষ্য দেবে বলে আশা করা যায়। নতুবা তাদের মনে এই ভয় থাকবে যে, তারা যদি কোনো অসততার আশ্রয় নেয়, তবে অন্যদের কসমের বিপরীতে তাদের কসম মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং সাক্ষ্য দেওয়ার অধিক হকদার হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাক্ষ্য বাতিল হবে।

৫. *মিরাস* (উত্তরাধিকার) বণ্টন

প্রত্যেক মুসলমানের সম্পদ তার মৃত্যুর পর নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে তার *ওয়ারিস* বা উত্তরাধিকারদের মধ্যে অবশ্যই বণ্টন করে দিতে হবে:

- মৃত ব্যক্তির ঋণ থাকলে সর্বপ্রথম তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করা হবে। তারপর তিনি যদি কোনো ওসিয়ত করে থাকেন, তা পূরণ করা হবে। অতপর মিরাস (উত্তরাধিকার) বণ্টন করা হবে।

- *ওয়ারিসের* অনুকূলে ওসিয়ত হতে পারে না; তবে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে তার অবস্থা, বিশেষ সেবা বা প্রয়োজন যদি এমনটি দাবি করে, তবে তার ব্যতিক্রম হতে পারে।

- পিতা-মাতা এবং স্ত্রী বা স্বামীর অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের উত্তরাধিকার হবে মৃত ব্যক্তির সন্তান। মৃত ব্যক্তি যদি কোনো ছেলে না রেখে যান এবং তার সন্তানদের মধ্যে দুই বা ততোধিক মেয়ে থাকে, তবে তাদেরকে অবশিষ্ট সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে। মেয়ে একজন হলে, সে এর অর্ধেকের অধিকারী হবে। মৃত ব্যক্তির সন্তানদের মধ্যে শুধু ছেলে থাকলে, এই সমস্ত সম্পদ তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। সন্তানদের মধ্যে ছেলে-মেয়ে উভয়ই থাকলে, একজন ছেলের অংশ দুইজন মেয়ের সমান হবে এবং এ অবস্থাতেও সমস্ত সম্পদ তাদের মধ্যেই বণ্টন করা হবে।

- সন্তান না থাকলে মৃত ব্যক্তির ভাই-বোন সন্তানদের স্থলাভিষিক্ত হবে। পিতা-মাতা এবং স্ত্রী বা স্বামী উপস্থিত থাকলে, তাদের অংশ দেওয়ার পর মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার এরা-ই হবে। পুরুষ ও নারীর জন্য তাদের অংশ এবং তাদের

মধ্যে উত্তরাধিকার বণ্টনের পদ্ধতি সেটা-ই, যা সন্তানের জন্য উপরের বর্ণনায় এসেছে।

- মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকুক বা না থাকুক এবং ভাই-বোন থাকলে পিতা-মাতার প্রত্যেককে অবশিষ্ট সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়া হবে। ভাই-বোনও যদি থাকে এবং কেবল পিতা-মাতা-ই মৃত ব্যক্তির *ওয়ারিস* হলে, রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ মায়ের এবং দুই-তৃতীয়াংশ বাবার অধিকার।

- মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে এবং তার সন্তান থাকলে, তার স্ত্রীকে রেখে যাওয়া সম্পদের এক-অষ্টমাংশ দেওয়া হবে। তার সন্তান না থাকলে, সে রেখে যাওয়া সম্পদের এক-চতুর্থাংশের অধিকারী হবে। মৃত ব্যক্তি নারী হলে এবং তার সন্তান না থাকলে, রেখে যাওয়া সম্পদের অর্ধেক তার স্বামীর; আর যদি তার সন্তান থাকে, তবে স্বামীকে রেখে যাওয়া সম্পদের এক-চতুর্থাংশ দেওয়া হবে।

- এই *ওয়ারিসদের* অনুপস্থিতিতে মৃত ব্যক্তি চাইলে কাউকে রেখে যাওয়া সম্পদের *ওয়ারিস* বানাতে পারে। যাকে *ওয়ারিস* বানানো হয়েছে, সে যদি আত্মীয় হয় এবং তার একজন ভাই বা বোন থাকে, তবে (ওই ভাই/বোনকে) এক-ষষ্ঠাংশ; আর একের বেশি ভাই-বোন থাকলে তাদেরকে এক-তৃতীয়াংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট ৫/৬ বা দুই-তৃতীয়াংশ [*যাকে ওয়ারিস বানানো হয়েছে*] তাকে দেওয়া হবে।

এই বণ্টন যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা 'আত্মীয়তার উপযোগিতা' [*এমন আত্মীয়তা, যা বাস্তব জীবনে একে অপরের উপকারে আসে*] এবং বণ্টনের অংশে পার্থক্যের কারণও এটাই যে, অংশপ্রাপ্তদের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির জন্য তাদের উপকার কম বা বেশি হওয়া। মেয়েদের উপকার বিয়ের পর তাদের স্বামীর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়; একইভাবে স্ত্রী স্বামীকে কেবল সাহচর্য দেয়, কিন্তু স্বামী সাহচর্যের পাশাপাশি স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্বও বহন করে। মূলত এই কারণে ছেলেদের অংশ মেয়েদের তুলনায় এবং স্বামীর অংশ স্ত্রীর তুলনায় দ্বিগুণ রাখা হয়েছে।

৫. দাওয়াতের বিধি-বিধান

ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হচ্ছে — যারা এই পৃথিবীতে সত্যকে গ্রহণ করবে, তারা তা গ্রহণের পর অন্যদেরও নিয়মিত সেই সত্যের উপদেশ ও নসিহত প্রদান করবে। ধর্মের এই দাবিটি সাধারণত 'দাওয়াত ও তাবলিগ' পরিভাষা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কুরআনে এর যে বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে, তাতে ইমানদারদের বিভিন্ন মর্যাদা ও অবস্থানের আলোকে দাওয়াতের দায়িত্ব তাদের ওপর আলাদা আলাদাভাবে অর্পণ করা হয়েছে।

বিষয়টিকে আমরা নিম্নোক্ত শিরোনামগুলোর অধীনে বর্ণনা করতে পারি:

নবীদের দাওয়াত

আল্লাহতায়ালার যে সকল নবী পৃথিবীতে এসেছেন, তারা আল্লাহর দিকে দাওয়াত এবং *ইনজার ও বাশারাত* (সতর্কবাণী ও সুসংবাদ) প্রদানের জন্যই এসেছেন। নবীদের সতর্কবাণী ও সুসংবাদ দেওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না; তবে নবীদের মধ্য থেকে আল্লাহতায়ালা যাদেরকে 'রিসালাত'-এর উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন, তাদের সম্পর্কে কুরআন জানিয়েছে যে, তারা এই সতর্কবাণীকে তাদের জাতির সামনে 'শাহাদাত'-এর পর্যায়ে পৌঁছে দিতে আদিষ্ট ছিলেন।

কুরআনের পরিভাষায় 'শাহাদাত'-এর অর্থ — সত্যকে মানুষের সামনে এমনভাবে স্পষ্ট করা যে, যাতে এরপর কারও জন্য সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে। এর পদ্ধতি হচ্ছে, আল্লাহ এই রাসুলদেরকে তাঁর আদালত প্রকাশের জন্য মনোনীত করেন এবং কিয়ামতের আগে একটি 'ছোট কিয়ামত' (*কিয়ামতে সুগরা*) তাদের মাধ্যমে এই দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাসুলদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা যদি আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারে অটল থাকে, তবে এর জন্য পুরস্কার এবং তা থেকে বিচ্যুত হলে এর শাস্তি তারা দুনিয়াতেই পাবেন। এর ফলে রাসুলদের অস্তিত্ব মানুষের জন্য আল্লাহর একটি নিদর্শনে পরিণত হয় এবং মানুষ যেন আল্লাহকে রাসুলদের সাথে জমিনে চলাফেরা করতে এবং বিচার করতে দেখছে। এর সাথে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যে সত্য তারা স্বচক্ষে দেখছেন, তা প্রচার করতে এবং আল্লাহর হেদায়াত কোনো প্রকার কমবেশি না করে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। এটাই হলো 'শাহাদাত'। রাসুলদের দাওয়াতে *ইনজার* (সতর্কবাণী), *ইনজারে আম* (সাধারণ সতর্কবাণী), *ইতমামে হুজ্জাত* (চূড়ান্ত দলিল-প্রমাণ পেশ) এবং হিজরত ও *বারাআত* (সম্পর্কচ্ছেদ)-এর পর্যায়গুলো অতিক্রম করে যখন এই 'শাহাদাত' প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে খোদায়ি ফয়সালার ভিত্তিতে পরিণত হয়। ফলে আল্লাহ এই রাসুলদের বিজয় দান করেন এবং তাদের দাওয়াত অস্বীকারকারীদের ওপর এই দুনিয়াতেই নিজের আজাব নাজিল করেন।

ইব্রাহিমের বংশধরদের দাওয়াত

এই দাওয়াত মূলত সেই 'শাহাদাত', যার উল্লেখ উপরে হয়েছে। কুরআন জানিয়েছে যে, ইব্রাহিমের বংশধরদেরও আল্লাহ এই শাহাদাতের জন্য একইভাবে মনোনীত করেছেন এবং এর দাবি পূরণের

জন্য সংগ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন; ঠিক যেভাবে তিনি আদম সন্তানদের মধ্য থেকে কিছু মহান ব্যক্তিত্বকে নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য মনোনীত করেন।

ইব্রাহিমের বংশধরদের এই মর্যাদার কারণে তারা যদি সত্যের ওপর অটল থাকে এবং তা কোনো প্রকার কমবেশি না করে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে পৃথিবীর সব জাতির কাছে পৌঁছে দেয় — তবে অমান্যকারীদের মুকাবিলায় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করেন; আর তারা যদি সত্য থেকে বিচ্যুত হয়, তবে অমান্যকারীদের মাধ্যমে তাদেরকে অপমান ও পরাধীনতার আজাবে পতিত করেন।

আলেমদের দাওয়াত

নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর পরে সতর্ক করার এই দায়িত্ব এই উম্মতের আলেমদের নিকট স্থানান্তরিত হয়েছে। আল্লাহতায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন যে, মুসলমানদের প্রতিটি দল থেকে যেন কিছু লোক বেরিয়ে আসে, ধর্মের জ্ঞান অর্জন করে এবং নিজের জাতির জন্য সতর্ককারী হয়ে তাদেরকে আখিরাতের আজাব থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে।

কুরআন থেকে জানা যায় যে, দাওয়াতের এই পদ্ধতিতে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখা উচিত:

প্রথমত — এই কাজে যারা অগ্রসর হবেন, তারা যে সত্য নিয়ে দাঁড়াবেন, সেটার ব্যাপারে তাদের নিজেদের ইমান সুদৃঢ় হতে হবে। তারা যে কথা মানুষের সামনে পেশ করবেন, সে বিষয়ে তাদের নিজেদের মন-মস্তিষ্ক এমনভাবে সন্তুষ্ট হতে হবে, যেন তারা অনুভব করেন যে — এটা তাদের অন্তরের বাণী এবং আত্মার আওয়াজ, যা তাদের জবান দিয়ে বের হচ্ছে। তারা নিজেদের পুরো

সত্তাকে প্রতিপালকের কাছে সঁপে দিয়ে এই ময়দানে নামবেন এবং মানুষকে যে বিষয়ে ডাকবেন, সে বিষয়ে সর্বপ্রথম নিজেরা ঘোষণা করবে — তারা পূর্ণ অন্তর ও পূর্ণ প্রাণ দিয়ে তা বিশ্বাস করেন।

দ্বিতীয়ত — তাদের কথা ও কাজে কোনো দিক থেকে যেন বৈপরীত্য না থাকে। তারা যে জিনিসের পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়াবেন, সবার আগে নিজেরা তা গ্রহণ করবেন এবং যে সত্যের দিকে মানুষকে ডাকবেন, তাদের নিজেদের কাজও যেন তারই সাক্ষ্য দেয়।

তৃতীয়ত — তারা সত্যের বিষয়ে কোনো প্রকার আপস করবেন না। ধর্মের ছোট থেকে ছোট সত্যও যখন তাদের সামনে স্পষ্ট হবে, তারা তা মন থেকে গ্রহণ করবেন, জবান দিয়ে তার সাক্ষ্য দেবেন এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করে তা হুবহু দুনিয়ার সামনে পেশ করবেন।

চতুর্থত — তাদের সতর্ক করার মাধ্যম হবে কুরআন মাজিদ। আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-কে কুরআন এই নির্দেশই দিয়েছে এবং এটার ভিত্তিতেই তিনি পুরো দুনিয়ার জন্য 'সতর্ককারী'। আলেমগণ মূলত তার এই সতর্কবাণীই মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়।

রাষ্ট্রীয় দাওয়াত

মুসলমানরা যদি কোনো ভূখণ্ডে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করে, তবে তাদের দায়িত্ব হলো — নিজেদের মধ্য থেকে কিছু লোককে এই কাজে নিযুক্ত করা, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, মন্দ কাজে বাধা দেবে এবং ভালো কাজের উপদেশ দেবে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই ফরজ কাজ মুসলমানদের *আরবাব-এ-হাল ও আকদ* (রাষ্ট্রীয়

দায়িত্বশীল বা শাসনকর্তা)-দের ওপর বর্তায়। তাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে: রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যান্য স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তারা অবশ্যই এই দায়িত্ব পালন করবেন।

ব্যক্তির দাওয়াত

ব্যক্তির দাওয়াত হলো — নিজ পরিবেশ এবং নিজ কার্যপরিধিতে একে অপরকে ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। দাওয়াতের এই নিয়মে আহ্বানকারী এবং যাকে আহ্বান করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য। বরং প্রতিটি মানুষ একই সাথে উপদেশ দানকারী এবং উপদেশ গ্রহণকারী। এই ফরজ বাবার জন্য ছেলের প্রতি এবং ছেলের জন্য বাবার প্রতি; স্ত্রীর জন্য স্বামীর প্রতি এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীর প্রতি; ভাইয়ের জন্য বোনের প্রতি এবং বোনের জন্য ভাইয়ের প্রতি; বন্ধুর জন্য বন্ধুর প্রতি এবং প্রতিবেশীর জন্য প্রতিবেশীর প্রতি — সহজ কথায়, প্রত্যেক মানুষকে তার পরিচিত বা কাছের মানুষদের কাছে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। সে যেখানে দেখবে যে, তার পরিচিত কেউ সত্যবিরোধী কোনো পথ অবলম্বন করেছে, তার উচিত নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে সঠিক পথ অনুসরণের নসিহত করা। এমন হতে পারে যে, সকালে আমরা কাউকে ভালো কাজের উৎসাহ দিচ্ছি, আর সন্ধ্যায় সে আমাদের ক্ষেত্রেও এই কাজ করছে। আজ আমরা কাউকে কোনো সত্য পৌঁছে দিচ্ছি, আর আগামীকাল সে আমাদেরকে সেই [*ভালোকাজের*] উপদেশ দিচ্ছে। মোটকথা, যখনই সুযোগ হবে, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের কর্মক্ষেত্রে এই কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া।

দাওয়াতের কৌশল

দাওয়াতের এই কৌশল দাওয়াতের প্রতিটি পর্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। কুরআন এটাকে একটি মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করেছে, যা নিচের তিনটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত:

প্রথমত — দাওয়াত সব সময় প্রজ্ঞা (*হিকমত*), উত্তম উপদেশ এবং সুন্দর বিতর্কের পদ্ধতিতে পেশ করতে হবে। 'প্রজ্ঞা' (*হিকমত*)-এর অর্থ: যুক্তি ও প্রমাণ এবং 'উত্তম উপদেশ'-এর মানে: দরদভরা নসিহত ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য হচ্ছে — যিনি দাওয়াত দেবেন, তিনি যা-ই বলবেন, তা যুক্তি-প্রমাণ এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকের আলোকে বলবেন; তার বলার ভঙ্গি আক্রমণাত্মক বা ধমক দেওয়ার মতো হবে না, বরং হবে শুভাকাঙ্ক্ষী এবং স্নেহ ও মমতার সাথে মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো। এমনকি যদি আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজনও পড়ে, তবে যেন পছন্দনীয় ও মার্জিত পথ বেছে নেওয়া হয়; আর এর জবাবে প্রতিপক্ষ যদি উস্কানি দেয়, তবে 'ইটের বদলে পাটকেল' না মেরে সত্যের আহ্বানকারী যেন সব সময় ভদ্র ও মার্জিত থাকেন।

দ্বিতীয়ত — দাওয়াত প্রদানকারীর দায়িত্ব শুধু দাওয়াত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ কথা পৌঁছে দেওয়া, সত্যকে সব দিক থেকে স্পষ্ট করা এবং উৎসাহ ও উপদেশ দানে নিজের পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি না রাখা। তিনি যদি এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন, তবে তিনি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলেন। মানুষের হেদায়েত বা গোমরাহির বিষয়টি আল্লাহ তাঁর নিজের হাতে রেখেছেন। তিনি তাদেরও চেনেন, যারা পথভ্রষ্ট এবং তাদেরও জানেন, যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত। অতএব, প্রত্যেকের সাথে তিনি সেই আচরণ করবেন, যার যোগ্য তারা। দাওয়াত প্রদানকারীর উচিত নয়

মানুষের ব্যাপারে 'দারোগা' হওয়া বা তার শ্রোতাদের জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা করা। এসব বিষয় আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট। সত্যের দাওয়াত প্রদানকারীর দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেওয়া; তার উচিত নিজের এই সীমানা কখনো অতিক্রম না করা।

তৃতীয়ত — দাওয়াতের শ্রোতারা যদি জুলুম-অত্যাচার এবং কষ্ট দেওয়ায় উদ্যত হয়, তবে দাওয়াত প্রদানকারীর নৈতিক সীমার মধ্যে থেকে ঠিক ততটুকু প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার আছে, যতটুকু কষ্ট তাকে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু আল্লাহর কাছে ধৈর্য ধরাই পছন্দনীয়। এই ধৈর্যের অর্থ হচ্ছে: সত্যের আহ্বানকারী সব কষ্ট সহ্য করবেন, কিন্তু না প্রতিশোধের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেবেন, না বিপদ-আপদে ঘাবড়ে গিয়ে নিজের অবস্থানে পরিবর্তন আনবেন। এই পরিস্থিতিতে ধৈর্যশীলদের জন্য বড় পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছে। এর প্রতিফল দুনিয়াতেও তাদের জন্য সর্বোত্তম হবে এবং খোদাতায়ালা চাইলে কিয়ামতেও তারা এর শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেখতে পাবেন।

৬. জিহাদের বিধি-বিধান

শান্তি ও *আজাদি* (স্বাধীনতা) মানব সভ্যতার এক অপরিহার্য প্রয়োজন। ব্যক্তির অবাধ্যতা থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য শাসন ও দণ্ডবিধি রয়েছে; কিন্তু কোনো জাতি যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তখন প্রত্যেকে জানে যে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। উপদেশ ও অনুশাসন যতক্ষণ কার্যকর থাকে, ততক্ষণ অস্ত্র ধারণ করাকে কেউ বৈধ মনে করে না। কিন্তু কোনো জাতির বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, উপদেশ ও অনুশাসনের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে আনা সম্ভব নয়, তখন মানুষের অধিকার রয়েছে যে, সে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে; আর ততক্ষণ পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখবে, যতক্ষণ না পৃথিবীতে শান্তি ও স্বাধীনতার পরিবেশ ফিরে আসে। কুরআনের নির্দেশ হলো — অস্ত্র ধরার এই অনুমতি যদি না দেওয়া হতো, তবে জাতিগুলোর অবাধ্যতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যেত যে, সভ্যতার ধ্বংসের কথা তো বাদই, এমনকি ইবাদতখানাগুলো পর্যন্ত জনশূন্য করা হতো এবং সেই জায়গাগুলোতে কেবল ধুলো উড়ত — যেখানে এখন রাত-দিন বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর নাম নেওয়া হয় এবং তাঁর ইবাদত করা হয়।

ইসলামি শরিয়তে জিহাদ[৬] এই উদ্দেশ্যে-ই করা হয়। জিহাদ না প্রবৃত্তির লালসার জন্য, না ধন-সম্পদের জন্য, না দেশ জয় বা রাজ্য শাসনের জন্য, না খ্যাতি ও নাম-ডাকের জন্য এবং না আত্মমর্যাদা, গোষ্ঠীপ্রীতি কিংবা শত্রুতার কোনো আবেগ চরিতার্থ করার জন্য। মানুষের স্বার্থপরতা ও পাশবিকতার সাথে এই জিহাদ ও লড়াইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা আল্লাহর যুদ্ধ, যা তাঁর বান্দারা তাঁর আদেশে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর পথে লড়াই করে। এই যুদ্ধে তাদের অবস্থান কেবল হাতিয়ার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো। এতে তাদের নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য নেই, বরং আল্লাহর উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ করাই তাদের কর্তব্য। অতএব, তারা নিজেদের এই অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হতে পারে না।

এর আইনগুলো নিম্নরূপ:

১. জিহাদের হুকুম

জিহাদ ও লড়াইয়ের নির্দেশ মুসলমানদেরকে সামষ্টিক সত্তা [*অর্থাৎ জামা'ত*] হিসেবে দেওয়া হয়েছে। কুরআনে এ বিষয়ে যত আয়াত এসেছে, মুসলমানরা তাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেগুলোর উদ্দেশ্য নয়। বরং হুদুদ ও দণ্ডবিধির মতোই এই আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য মুসলমানদের সামষ্টিক সত্তা (জামাত)। অতএব, এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার কেবল তাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের-ই রয়েছে। তাদের ভিতরের কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনোভাবেই এই অধিকার

[৬] জিহাদের শাব্দিক অর্থ: কোনো প্রচেষ্টায় নিজের পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কুরআনে এই শব্দটি যেমন আল্লাহর পথে সাধারণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি এটা 'কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে যুদ্ধের অর্থেও এসেছে। এখানে এর এই দ্বিতীয় অর্থ (অর্থাৎ যুদ্ধ) উদ্দেশ্য।

রাখে না যে, তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেবে।

২. জিহাদের উদ্দেশ্য

কুরআনে জিহাদের নির্দেশ মূলত 'ফিতনা' নির্মূলের জন্য এসেছে। এর অর্থ — কোনো ব্যক্তিকে জুলুম ও জবরদস্তির মাধ্যমে তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করা। এটাকে ইংরেজি ভাষায় Persecution শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। জান ও মাল এবং বুদ্ধি-বিবেক ও মতামত প্রকাশের বিরুদ্ধে সব ধরনের অন্যায় হস্তক্ষেপ এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, জুলুম ও অবিচার যে রূপেই হোক না কেন — তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা যেতে পারে।

৩. জিহাদের ফরজ হওয়া

জিহাদ মুসলমানদের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত ফরজ হয় না, যতক্ষণ না শত্রুর মুকাবিলায় তাদের সামরিক শক্তি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পৌঁছায়। অতএব, জিহাদ ও লড়াইয়ের এই দায়িত্ব পালনের জন্য এটা জরুরি যে, তারা কেবল নিজেদের নৈতিক অস্তিত্ব সুদৃঢ় করার চেষ্টাই করবে না, বরং নিজেদের সামরিক শক্তিও সেই স্তর পর্যন্ত অবশ্যই বৃদ্ধি করবে, যার নির্দেশ কুরআন রিসালাত-যুগের মুসলমানদের তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী দিয়েছিল এবং তাদের ও তাদের শত্রুদের মধ্যে ১:২ (এক অনুপাত দুই) অনুপাত নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

৪. জিহাদে অংশগ্রহণ

জিহাদে বাস্তবে অংশ না নেওয়া কেবল তখনই অপরাধ, যখন কোনো মুসলমান সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ যুদ্ধ ঘোষণার পরেও ঘরে বসে থাকে। তখন এটা নিঃসন্দেহে মুনাফিকির মতো বড়

অপরাধে পরিণত হয়। এই পরিস্থিতি না থাকলে জিহাদ একটি *ফজিলত*, যা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকের মধ্যে থাকা উচিত। কিন্তু এর মর্যাদা *ফজিলতের* আওতায়-ই থাকবে; এটা ঐ ফরজের অন্তর্ভুক্ত নয়, যা পালন না করলে মানুষ অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

৫. জিহাদ থেকে পলায়ন

জিহাদ ও লড়াইয়ের জন্য ময়দানে নামার পর কাপুরুষতা দেখানো এবং রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হারাম। কোনো ইমানদারের কখনোই এমনটি করা উচিত নয়। এটা আল্লাহতায়ালার সাহায্যের ওপর আস্থাহীনতা, পরকালের চেয়ে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং জীবন-মৃত্যুকে নিজের কৌশলের ওপর নির্ভরশীল মনে করার অপরাধ — যার কোনো স্থান ইমানের সাথে থাকতে পারে না।

৬. নৈতিক সীমা

নৈতিক সীমা লঙ্ঘন করে জিহাদ করা সম্ভব নয়। নৈতিকতা সর্বাবস্থায় এবং সব কিছুর ওপর অগ্রাধিকার পায়। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ও আল্লাহতায়ালা নৈতিক সীমা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অনুমতি কাউকে দেননি। এই নির্দেশের অধীনে কুরআনে বর্ণিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত হচ্ছে: অঙ্গীকার বা চুক্তি পালন করা। বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ করাকে আল্লাহতায়ালা নিকৃষ্টতম গুনাহ হিসেবে গণ্য করেছেন। অতএব, কোনো চুক্তিবদ্ধ জাতি যদি মুসলমানদের ওপর জুলুমও করে, তবে চুক্তির লঙ্ঘন করে (আক্রান্তদের) সাহায্য করা যাবে না। একইভাবে, যারা যুদ্ধের সময় কোনো কারণে নিরপেক্ষ থাকতে চায়, তাদের বিরুদ্ধেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি নেই।

জিহাদের জন্য বের হওয়ার সময় অহংকার ও লোকদেখানোর মানসিকতা রাখা উচিত নয়। দম্ভ এবং জাঁকজমক কোনো মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়। রণক্ষেত্র হোক বা সাধারণ সভা — খোদাতায়ালার বান্দাদের মধ্যে সর্বাবস্থায় দাসত্বের বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পাওয়া উচিত।

৭. ঐশী সাহায্য (*নুসরত-এ-ইলাহি*)

মুসলমানরা এই যুদ্ধ আল্লাহর ওপর ভরসা করে লড়ে, কিন্তু কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এতে আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হলো 'সবর ও সুদৃঢ়তা'। মুসলমানদের কোনো জামাতের জন্য আল্লাহর সাহায্যের অধিকার ততক্ষণ তৈরি হয় না, যতক্ষণ না তারা এই গুণ নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে।

৮. যুদ্ধবন্দী

যুদ্ধের বন্দীদের মুসলমানরা মুক্তিও দিতে পারে, অথবা তাদের থেকে মুক্তিপণও নিতে পারে। কিন্তু তাদের হত্যা করা, অথবা দাস-দাসী বানিয়ে রাখার পথ কুরআন মাজিদ চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে।

৯. গনিমতের মাল

গনিমতের মাল মূলত সামষ্টিক উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে মুজাহিদদের কোনো চিরস্থায়ী অধিকার এতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি যে, মুসলমানদের সরকার তা সর্বাবস্থায় [*তাদেরকে*] প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। সরকার তার পরিস্থিতি এবং সামাজিক প্রয়োজনের নিরিখে এ বিষয়ে যে পদ্ধতি চাইবে, গ্রহণ করতে পারে।

৭. হুদুদ ও তাজিরাত (দণ্ডবিধি)

ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতার নিয়ামত যেখানে এই দুনিয়াতে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় শ্রেষ্ঠত্ব, সেখানে এর একটি অনিবার্য পরিণতি এটাও যে, ইচ্ছা ও স্বাধীনতার অপব্যবহারের কারণে বারবার জমিনে ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। মানব ইতিহাসে এই ফাসাদের প্রথম প্রকাশ মানবজাতির পিতা আদমের পুত্র কাবিলের হাতে হয়েছিল; সুতরাং এর সাথে সাথেই এই প্রয়োজন সামনে চলে এসেছিল যে, মানুষকে স্বয়ং মানুষের এই অনিষ্ট ও ফাসাদ থেকে বাঁচানোর কোনো ব্যবস্থা থাকা উচিত। আল্লাহতায়ালা মানুষের *ফিতরাতে* যে হাকিকত গেঁথে দিয়েছেন, সেটার আলোকে এই বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট ছিল যে, এর একমাত্র পথ হলো — অপরাধের আগে পরিবেশের পরিবেশের সংশোধন, শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ, দাওয়াত ও নসিহত এবং অপরাধের পর যথাযথ শাস্তি ও সতর্কতা প্রদান। কিন্তু এই শাস্তি ও সতর্কতা কোন অপরাধে কতটুকু এবং কোন পদ্ধতিতে হওয়া উচিত? এটা নির্ধারণের কোনো ভিত্তি যেহেতু মানবীয় বুদ্ধি-বিবেকের নিকট ছিল না, তাই আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীদের মাধ্যমে মানুষকে যে শরিয়ত দিয়েছেন, তাতে জীবনের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জান, মাল, ইজ্জত এবং সামাজিক শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সকল বড় অপরাধের শাস্তি তিনি নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এই অপরাধসমূহ নিম্নরূপ:

১. *মুহারাবা* (বিদ্রোহ) এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা।

২. হত্যা ও জখম।

৩. জিনা-ব্যভিচার।

৪. কাজফ (অপবাদ)।

৫. চুরি।

শরিয়তে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত, সেগুলো মূলত এগুলোই। এগুলোর লঘু বা নিম্নতর রূপ এবং এগুলো বাদে অন্যসব অপরাধের বিষয় আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের *আরবাব-এ-হাল ও আকদ* (রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল বা শাসনকর্তা)-দের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তারা এই বিষয়ে যে আইন চাইবে, তৈরি করতে পারবে। তবে এতটুকু কথা এক্ষেত্রেও নির্ধারিত যে, কুরআনের দৃষ্টিতে হত্যা এবং *ফাসাদ ফিল আরদ* (জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি) ছাড়া অন্য কোনো অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যযেতে পারে না। একইভাবে এই বিষয়টিও নির্ধারিত যে, এই অপরাধসমূহের শাস্তির হুকুম মুসলমানদেরকে তাদের ব্যক্তিগত মর্যাদায় নয়, বরং পুরো মুসলমান সমাজকে দেওয়া হয়েছে এবং এই দিক থেকে এটা তাদের সামাজিক শৃঙ্খলার সাথে সংশ্লিষ্ট।

আমরা এখানে এই শাস্তিগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করব:

মুহারাবা (বিদ্রোহ) এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা

আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) দুনিয়াতে বিদ্যমান এবং লোকেরা তার শাসনে তার কোনো হুকুম বা ফয়সালার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তবে তা আল্লাহ ও রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর সাথে *মুহারাবা* (বিদ্রোহ)। 'ফাসাদ ফিল আরদ'-এর ব্যাখ্যাও অনুরূপ। এটা সেই পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়, যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আইনের বিরোধিতা করে মানুষের জান-মাল, ইজ্জত এবং বুদ্ধি-বিবেক ও মতামতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অতএব, হত্যা যখন সন্ত্রাসবাদ, জিনা-ব্যভিচার যখন ধর্ষণ এবং চুরি যখন ডাকাতিতে পরিণত হয়; অথবা লোকজন যখন জিনা-ব্যভিচারকে পেশা বানায়; অথবা প্রকাশ্যে উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতে ওঠে; অথবা নিজেদের বেপরোয়া স্বভাব, দুষ্কৃতিকারিতা ও যৌন অনাচারের কারণে ভদ্রলোকদের সম্মান ও সম্ভ্রমের জন্য হুমকিতে পরিণত হয়; অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়; অথবা অপহরণ, নাশকতা, ত্রাস সৃষ্টি এবং এ ধরনের অন্যান্য গুরুতর অপরাধের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে, তবে তারা 'ফাসাদ ফিল আরদ'-এর অপরাধী হবে। তাদের দমনের জন্য এই চারটি সাজা নির্ধারিত করা হয়েছে:

১. দৃষ্টান্তমূলক পদ্ধতিতে হত্যা করা।

২. দৃষ্টান্তমূলক পদ্ধতিতে শূলে চড়ানো।

৩. হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া।

৪. এলাকা থেকে বহিষ্কার করা বা দেশান্তর করা।

এই শাস্তি সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় শর্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে:

প্রথমত, কুরআন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে এই অধিকার দিয়েছে যে, অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধীর অবস্থা এবং অপরাধের বর্তমান ও সম্ভাব্য প্রভাবের আলোকে এগুলোর মধ্য থেকে যে শাস্তি উপযুক্ত মনে করবে, সেটা তারা এমন অপরাধীদেরকে দিতে পারবে। দৃষ্টান্তমূলক পদ্ধতিতে হত্যা এবং শূলে চড়ানোর মতো শাস্তির সাথে

এখানে দেশান্তরের সাজা এজন্য রাখা হয়েছে, যেন শাস্তির চরম কঠোরতার সাথে পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী অপরাধীর সাথে নমনীয়তার সুযোগও বাকি থাকে।

দ্বিতীয়ত, অপরাধ যদি দলবদ্ধভাবে সংঘটিত হয়, তবে তার শাস্তি ব্যক্তি হিসেবে নয়, বরং সেই দলকে দল হিসেবেই দেওয়া হবে। অতএব, অপরাধীদের কোনো দল যদি *ফাসাদ ফিল আরদ*-এর পদ্ধতিতে হত্যা, অপহরণ, জিনা-ব্যভিচার, নাশকতা, ত্রাস সৃষ্টি এবং এ ধরনের অন্যান্য অপরাধে লিপ্ত হয়, তবে এটা তদন্তের প্রয়োজন নেই যে, সুনির্দিষ্টভাবে অপরাধটি কার হাতে সংঘটিত হয়েছে এবং কার হাত দিয়ে হয়নি; বরং দলের প্রতিটি সদস্য এই দায়ে অংশীদার বলে গণ্য হবে এবং তার সাথে আচরণও অবশ্যই এরই আলোকে হবে।

তৃতীয়ত, এ ধরনের অপরাধীদের সাজা দেওয়ার সময় কারও মনে সহানুভূতির কোনো আবেগ সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। যিনি তাদের স্রষ্টা — সেই প্রতিপালক এই অপরাধগুলো [*উল্লেখ করার*] পর তাঁর ফয়সালা এটাই যে, তাদেরকে এই দুনিয়াতেই একেবারে লাঞ্ছিত করা হোক। এই শাস্তিসমূহের উদ্দেশ্য এটাই এবং তা সর্বাবস্থায় সামনে রাখতে হবে।

চতুর্থত, এ ধরনের অপরাধীরা যদি রাষ্ট্রীয় কোনো পদক্ষেপের আগে নিজেরাই এগিয়ে এসে নিজেদেরকে আইনের হাতে তুলে দেয়, তবে তাদের সাথে সাধারণ অপরাধীদের মতোই আচরণ করা হবে। এই অবস্থায় তাদের 'মুহারাবা' বা 'ফাসাদ ফিল আরদ'-এর অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে না।

হত্যা ও জখম

হত্যা ও জখমের *কিসাস* তথা বদলা নেওয়া ফরজ, যা মুসলমানদের সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়েছে। সমাজের জন্য এতেই জীবন রয়েছে এবং মুসলমানদের জন্য এটা আল্লাহতায়ালার নাজিলকৃত আইন, যা থেকে বিচ্যুতি কেবল জালিমরা-ই করে, অতএব রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে: তার এলাকায় যদি কোনো ব্যক্তি খুন হয়, তবে তার খুনিদের খুঁজে বের করা, তাদের গ্রেপ্তার করা এবং আইন অনুযায়ী তাদের থেকে কিসাস গ্রহণ করা।

কিসাসের ব্যাপারে পূর্ণ সমতা বজায় রাখতে হবে, অতএব যদি কোনো গোলাম (ক্রীতদাস) খুনি হয়, তবে তার বদলে সেই গোলাম এবং কোনো স্বাধীন ব্যক্তি খুনি হলে, তার বদলে সেই স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। কোনো ব্যক্তির সামাজিক ও গোষ্ঠীগত মর্যাদা এ বিষয়ে কোনোভাবেই অগ্রাধিকার পাওয়ার কারণ হওয়া উচিত নয়।

স্বয়ং আহত ব্যক্তি বা নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা যদি প্রাণের বদলে প্রাণ, অঙ্গের বদলে অঙ্গ এবং জখমের বদলে জখমের দাবি না করে এবং অপরাধীর সাথে নমনীয়তা প্রদর্শনে প্রস্তুত হয়, তবে আদালত অপরাধের ধরন এবং অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করে তাকে লঘু শাস্তিও দিতে পারে। এটা খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য একটি ছাড় এবং তাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ। অতএব, এই অপরাধের ক্ষতিগ্রস্তরা যদি এটা গ্রহণ করে, তবে আল্লাহতায়ালার দরবারে তাদের এই ক্ষমা তাদের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।

[এ অবস্থায়] আহত বা নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদেরকে অপরাধীর পক্ষ থেকে *দিয়াত* (রক্তপণ) দেওয়া হবে। আল্লাহতায়ালা বলেছেন যে,

তা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে আদায় করা উচিত।

হত্যা যদি ভুলবশত হয় এবং নিহত ব্যক্তি ইসলামি রাষ্ট্রের কোনো মুসলমান নাগরিক হয়, অথবা ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক না হলেও কোনো চুক্তিবদ্ধ জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে খুনির জন্য আবশ্যক হচ্ছে, যদি তাকে ক্ষমা না করা হয়, তবে সমাজের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সে *দিয়াত* (রক্তপণ) আদায় করবে এবং এই অপরাধের কাফফারা হিসেবে ও নিজের প্রতিপালকের দরবারে তওবার জন্য তার সাথে একজন মুসলমান গোলামও মুক্ত করবে। কিন্তু নিহত ব্যক্তি যদি শত্রু জাতির কোনো মুসলমান হয়, তবে খুনির ওপর *দিয়াত* বা রক্তপণের কোনো দায় নেই। এই অবস্থায় এটাই যথেষ্ট যে, নিজের এই গুনাহ ধুয়ে মুছে ফেলার জন্য সে একজন মুসলমান গোলাম মুক্ত করবে। এই উভয় অবস্থায় যদি গোলাম সহজলভ্য না হয়, তবে তার বদলে তাকে টানা দুই মাস রোজা রাখতে হবে।

জিনা-ব্যভিচার

জিনাকারী পুরুষ হোক বা নারী — তার অপরাধ যদি প্রমাণিত হয়, তবে এর শাস্তি হিসেবে তাকে একশ বেত্রাঘাত করা হবে।

অপরাধীকে এই শাস্তি মুসলমানদের একটি জামাতের উপস্থিতিতে দেওয়া হবে, যাতে এটা তার জন্য লাঞ্ছনা এবং অন্যদের জন্য উপদেশের কারণ হয়। কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, ইমানদারদের কোনো সরকার বা আদালতের জন্য এই বিষয়ে কোনো প্রকার নমনীয়তা প্রদর্শন করা উচিত হবে না।

এই শাস্তির পর কোনো সচ্চরিত্র পুরুষ বা নারীর এই জিনাকারী বা জিনাকারিনীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহতায়ালা এটাকে হারাম করেছেন।

এটা এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি এবং কেবল সেই অপরাধীদেরই দেওয়া হবে, যাদের মাধ্যমে অপরাধটি চূড়ান্ত পর্যায়ে সংঘটিত হবে এবং তাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা কোনো ছাড় পাওয়ার যোগ্য নয়। অতএব, শাস্তি সহ্য করতে অক্ষম, নিরুপায় এবং অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত সকল লোক নিশ্চিতভাবে এর থেকে ব্যতিক্রম।

কাজফ (অপবাদ)

এর দুটি রূপ রয়েছে:

এক — কোনো ব্যক্তি কোনো শরিফ (সম্মানিত) এবং সচ্চরিত্র নারী বা পুরুষের ব্যাপারে জিনার অপবাদ দেওয়া।

দুই — এ ধরনের বিষয় কোনো স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সংঘটিত হওয়া।

প্রথম অবস্থায়, ঐ ব্যক্তিকে সর্বাস্থায় চারজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী পেশ করতে হবে। সে এতে অক্ষম হলে, তাকে *কাজফ*-এর অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে। *কাজফের* শাস্তি হচ্ছে: তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং তার সাক্ষ্য পরবর্তীতে আর কোনো বিষয়েই গ্রহণ করা হবে না। কুরআনের নির্দেশ হলো, এই অপরাধের লিপ্ত ব্যক্তিরা আল্লাহতায়ালার দরবারে ফাসিক (পাপী) হিসেবে গণ্য হবে — তবে যদি তারা নিজেদের অপরাধের ব্যাপারে তওবা করে এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের সংশোধন করে [*তাদের কথা ভিন্ন*]।

দ্বিতীয় অবস্থায়, সাক্ষ্য না থাকলে এ বিষয়ের ফয়সালা কসমের ভিত্তিতে হবে। এর পদ্ধতি এমন হবে: স্বামী চারবার আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে যে, সে যে অভিযোগ করছে তাতে সে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, সে যদি এই অভিযোগে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার ওপর খোদার লানত বর্ষিত হোক। এর জবাবে স্ত্রী যদি এ ধরনের কোনো কসম দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন না করে, তবে তার ওপর জিনার সেই শাস্তি কার্যকর হবে, যা শরিয়তে তার জন্য নির্ধারিত। কিন্তু সে যদি এই অভিযোগ স্বীকার না করে, তবে কেবল তখনই শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে, যখন সে চারবার আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে যে, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে: যদি এ ব্যক্তি সত্য বলে, তবে আমার ওপর খোদাতায়ালার গজব নাজিল হোক।

স্ত্রী স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করলে, তখনও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

চুরি

এর শাস্তি হাত কাটা। চোর পুরুষ হোক বা নারী — তার অপরাধ যদি প্রমাণিত হয়, তবে এর শাস্তি হিসেবে তার ডান হাত কবজি থেকে কাটা হবে। জিনার মতো এটাও এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি এবং [*এই শাস্তি*] কেবল তখনই দেওয়া হবে, যখন অপরাধী তার অপরাধের প্রকৃতি এবং নিজের পরিস্থিতি অনুযায়ী কোনো ছাড় পাওয়ার যোগ্য না থাকে।

৮. খাদ্য ও পানীয়

ধর্মের প্রতিটি দিক থেকে মানুষের নফসের *তাজকিয়া* বা পরিশুদ্ধি চায়, এজন্য ধর্ম সব সময় এই বিষয়ে জোর দিয়েছে যে, আত্মিক পবিত্রতার সাথে সাথে পানাহারের বস্তুসমূহের ব্যাপারেও 'খবিস ও তাইয়্যেব' তথা অপবিত্র ও পবিত্রের পার্থক্য যেন সর্বাবস্থায় বজায় থাকে। মানুষের *ফিতরাত* এই বিষয়ে সাধারণত তাকে সঠিক পথনির্দেশনা প্রদান করে এবং সে কোনো দ্বিধা ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, কোনটি পবিত্র (*তাইয়্যেব*) এবং কোনটি অপবিত্র (*খবিস*)। সে চিরকালই জানে যে, সিংহ, চিতা, হাতি, চিল, কাক, শকুন, ঈগল, সাপ, বিচ্ছু এবং স্বয়ং মানুষ কোনো খাদ্যবস্তু নয়। সে জানে যে, ঘোড়া এবং গাধা দস্তরখানের স্বাদের জন্য নয়, বরং এগুলোকে *সওয়ারি* বা বাহনের কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এই প্রাণীগুলোর মলমূত্রের অপবিত্রতা সম্পর্কেও সে পুরোপুরি অবগত। নেশাজাতীয় দ্রব্যের অপবিত্রতা বোঝার ক্ষেত্রেও তার বুদ্ধি-বিবেক সাধারণত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। অতএব খোদাতায়ালার শরিয়ত এই বিষয়ে মানুষকে মূলত তার *ফিতরাতের* নির্দেশনার ওপরই ছেড়ে দিয়েছে।

মানুষের এই *ফিতরাত* কখনো কখনো বিকৃত হয়, কিন্তু দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাসের অধ্যয়ন বলে যে, তাদের একটি বড় অংশ এই বিষয়ে সাধারণত ভুল করে না। মূলত এই কারণে শরিয়ত এ ধরনের

কোনো বিষয়কে তার আলোচনার বিষয় বানায়নি। এই অধ্যায়ে শরিয়তের আলোচ্য বিষয় কেবল সেসব প্রাণী এবং তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি — যেগুলোর হালাল ও হারামের সিদ্ধান্ত কেবল বুদ্ধি-বিবেক ও *ফিতরাতের* নির্দেশনায় গ্রহণ করা মানুষের জন্য সম্ভব ছিল না। শূকর গবাদি পশুর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সে হিংস্র প্রাণীর মতো মাংসও খায়, এমতাবস্থায় তাকে কি খাওয়ার উপযোগী প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হবে নাকি হবে না? যেসব প্রাণী আমরা জবাই করে খাই, সেগুলো যদি জবাই করা ছাড়া মারা যায়, তবে তাদের ব্যাপারে হুকুম কী হওয়া উচিত? এই প্রাণীগুলোর রক্ত কি তাদের মলমূত্রের মতো অপবিত্র, নাকি সেগুলোকে হালাল ও পবিত্র ঘোষণা করা হবে? এগুলো যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবাই করা হয়, তারপরও কি এগুলো হালাল থাকবে? এই প্রশ্নগুলোর কোনো স্পষ্ট ও অকাট্য জবাব যেহেতু মানুষের জন্য দেওয়া কঠিন ছিল, এজন্য আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীদের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েছেন যে, শূকর, রক্ত, মৃত প্রাণী এবং খোদা ছাড়া অন্য কারও নামে জবাই করা প্রাণীও খাওয়ার জন্য পবিত্র নয় এবং মানুষের উচিত সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা।

এই বিধানের যে ব্যাখ্যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে:

১ — স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যাওয়া প্রাণী এবং আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া প্রাণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হবে না, এই দুটোই সমানভাবে মৃত হিসেবে গণ্য হবে। কোনো হিংস্র পশুর ছিঁড়ে ফেলা প্রাণীও মৃত — যদি না তাকে জীবিত পাওয়া যায় এবং তখন জবাই করে নেওয়া হয় [তাহলে তা ভিন্ন কথা]।

২ — প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণী যদি শিকারকে ছিঁড়ে ফেলে এবং শিকার জবাই করার সুযোগ আসার আগেই প্রাণ হারায়, তবে এমন ক্ষেত্রে শিকারি প্রাণীর ছিঁড়ে ফেলাই ঐ জন্তুর 'তাযকিয়া' তথা

জবাই সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে, সুতরাং তাকে জবাই করা ছাড়াই খাওয়া যেতে পারে। তবে এর জন্য জরুরি হলো যে, শিকারি প্রাণী যেন জন্তুটি তার মালিকের জন্য ধরে রাখে। তাতে যদি শিকারি প্রাণীটি কিছু খেয়ে ফেলে, তবে সেই শিকার আর জায়েজ থাকবে না।

৩ — সেই প্রাণীও হারাম, যা কোনো আস্তানাতে বা বেদিতে জবাই করা হয়েছে। পশু জবাইয়ের সময় যদি 'গাইরুল্লাহ' তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেওয়া হয়নি, কিন্তু সেখানে আল্লাহর নামও নেওয়া হয়নি, তবে সেটাও এই হারামের অন্তর্ভুক্ত। একই বিষয় সেই জবাইকৃত পশু ও শিকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, কিন্তু নাম নেওয়া ব্যক্তি আল্লাহতায়ালাকে বিশ্বাস করে না, অথবা বিশ্বাস করলেও [*আল্লাহকে*] দেবতাদের মজলিসে একজন 'রব্বুল আরবার' (প্রভুদের প্রভু) হিসেবে মানে এবং শিরক-কে মূলত নিজের ধর্ম হিসেবে গণ্য করে।

৪ — এই হারামসমূহের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে: নিরুপায় অবস্থা — এবং সেটাও এভাবে যে, ব্যক্তি তাতে আগ্রহী হবে না এবং প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করবে না।

৯. রসম-রেওয়াজ ও আদব-কায়দা

মানুষের আত্মশুদ্ধি জীবনযাপনের যেসব পদ্ধতি এবং সভ্যতার যেসব নিদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, পারিভাষিকভাবে সেগুলোকে আমরা রসম-রেওয়াজ ও আদব-কায়দা বলি। মানব সমাজের কোনো যুগই এই রসম-রেওয়াজ ও আদব-কায়দা থেকে খালি ছিল না। আমরা এগুলোকে প্রতিটি গোত্রে, প্রতিটি জাতিতে এবং প্রতিটি সভ্যতায় একইভাবে প্রচলিত একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে দেখে আসছি। বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর পরিচয় একে অপরের তুলনায় প্রধানত এগুলোর মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। নবী (*আলাইহিমুস সালাম*)-গণ যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন, সেটা-ও নিজের অনুসারীদেরকে কিছু রসম-রেওয়াজ ও আদব-কায়দা মেনে চলতে নির্দেশ দেয়। ধর্মের উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি, অতএব ধর্মের এই রসম-রেওয়াজ ও আদব-কায়দাগুলোও এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই নির্ধারিত হয়েছে। এই রসম-রেওয়াজ ও আদব-কায়দাগুলো নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর নাম নিয়ে এবং ডান হাত দিয়ে পানাহার করা। এগুলোর মধ্যে প্রথম বিষয়টি আল্লাহতায়ালার নিয়ামতসমূহের স্বীকৃতি ও স্বীকারোক্তি এবং সেগুলোতে বরকতের দোয়ার জন্য; আর দ্বিতীয়টি এই সত্যকে সবসময় স্মরণের জন্য যে, জান্নাতের নিয়ামত কিয়ামতের দিন যারাই

লাভ করবে, তাদেরকে আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে।

২. সাক্ষাতের সময় اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُم (*আস-সালামু আলাইকুম*) এবং তার জবাব দেয়া।

৩. হাঁচি দেয়ার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه (*আল-হামদুলিল্লাহ*) বলা এবং তার জবাবে يَرْحَمُكَ الله (*ইয়ারহামু-কাল্লাহু*) বলা।

৪. গোঁফ বা মোচ ছোট রাখা।

৫. নাভীর নিচের পশম কাটা।

৬. বগলের পশম পরিষ্কার করা।

৭. বড় হয়ে যাওয়া নখ কাটা।

৮. পুরুষদের খতনা করা।

৯. নাক, মুখ এবং দাঁতের পরিচ্ছন্নতা।

১০. *ইসতিনজা* [*প্রসাব ও পায়খানার পর পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা*]।

১১. *হায়েজ* ও *নেফাসের* পর গোসল।

১২. *জানাবাতের* গোসল [*বীর্যপাত ও যৌন মিলনের পর যে গোসল করা হয়*]।

১৩. মৃতের গোসল, দাফন ও কাফন।

১৪. ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার উৎসব।

১০. কসম এবং কসমের কাফফারা

ধর্মে কসমের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা ইসলামের মৌলিক নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত। কসম এই প্রতিশ্রুতিকে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে সুদৃঢ় করে। মুসলমান যখন নিজের কোনো সংকল্প, ইচ্ছা বা প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে আল্লাহর কসম করে, তখন সে যেন নিজের প্রতিপালক এবং জগতের বাদশাহকে নিজের কথার ব্যাপারে সাক্ষী রাখে। কসমের এই গুরুত্ব সত্ত্বেও বারবার এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, মানুষের জন্য নিজের কসম পূর্ণ করা সম্ভব হয় না, অথবা সে অনুভব করে যে, এর ফলে আল্লাহর বা তার নিজের অথবা অন্যদের কোনো অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। এই অবস্থায় কসম ভাঙা যেতে পারে, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কসম ভেঙে দেওয়া ধর্ম ও নৈতিকতার দিক থেকে জরুরি হয়ে পড়ে। শরিয়তে এর জন্য কাফফারার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বিধান নিচে দেওয়া হলো:

১ — কসম কখনও কখনও একেবারে নিরর্থক, অকার্যকর এবং অবান্তর হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুমিন বান্দার উচিত এমনটি থেকেও বেঁচে থাকা। কিন্তু নিজের বান্দাদের প্রতি আল্লাহতায়ালার এটা অশেষ নিয়ামত যে, তিনি এ ধরনের কসমের ব্যাপারে [*তাদেরকে*] দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো জবাবদিহিতার মুখোমুখি করবেন না।

২ — এর বিপরীতে, যদি কসম দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে এবং মনের ইচ্ছা থেকে করা হয়, তার মাধ্যমে কোনো অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি করা হয়, তার দ্বারা অধিকার ও কর্তব্যের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে, অথবা তা খোদার কোনো হালাল বা হারামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তবে তার ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা অবশ্যই [*বান্দাকে*] জবাবদিহির মুখোমুখি করবেন। সুতরাং কসমের বিষয়ে মানুষের কখনোই উদাসীন ও শিথিল হওয়া উচিত নয়, বরং পূর্ণ দায়িত্বের সাথে তার হেফাজত করা উচিত।

৩ — এ ধরনের কসম যদি কোনো কারণে ভাঙতে হয়, তবে জরুরি যে তার কাফফারা আদায় করা হবে। কাফফারার পদ্ধতি হচ্ছে: কসমকারী দশজন মিসকিনকে সেই মানের খাবার খাওয়াবে, যা সে সাধারণত নিজের পরিবার-পরিজনকে খাওয়ায় অথবা তাদের পরিধানের কাপড় দেবে অথবা একজন দাস আজাদ করবে। এগুলোর মধ্যে কোনো কিছুই সহজলভ্য না হলে, তাকে তিনদিন রোজা রাখতে হবে।

নির্ঘণ্ট

অ

অপবিত্র, ১৮৮, ১৮৯

আ

আখলাকিয়াত, ২৪, ৩২, ৬৭, ৮৩
আখিরাত, ৪৬
আজাদি, ১৭৫
আজাব, ২৬, ৪৬, ৫৪, ৬০, ৬৪, ৬৫, ১৬৯, ১৭০
আদল, ৬৯, ৭০, ১৫৬
আমলে সালেহ, ২৮, ৬৭
আরবাব-এ-হাল ও আকদ, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১৭১, ১৮১
আল-কিতাব, ২৩, ২৪, ৯৩
আল-হিকমা, ২৩, ২৪, ৩২
আল্লাহতায়ালা, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৯, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৯৮, ১০১, ১০৮, ১১২, ১১৫, ১১৬, ১২২, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪০, ১৪৪, ১৪৭, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৯, ১৬০, ১৬৮, ১৭০, ১৭৮, ১৮০, ১৮১, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৯, ১৯৪

ই

ইখলাস, ২২, ৫৪, ৮৬, ৮৭, ৯৪
ইজমা, ২০, ২১
ইতমামে হুজ্জাত, ৩৭, ৪৬, ৪৮, ৬০, ৬৩, ১৬৯
ইতিকাফ, ৯৪, ১১৩
ইদ্দত, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬
ইনজিল, ৪৯, ৫৫
ইনসাফ, ৩০, ৫৭, ১৩৮, ১৫২
ইবাদত, ২২, ২৩, ৩১, ৭২, ৯১, ৯৪, ১০৭, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১১৯, ১২৯, ১৭৫
ইব্রাহিম, ২৬, ৪৬, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১২৫, ১২৯
ইব্রাহিমি, ২১, ৩৪, ৯৬, ১০৮, ১১৫, ১১৭

ইমান, ১১, ২৩, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪৭, ৫৪, ৫৫, ৫৯, ৬৪, ৬৭, ৮৬, ১৫৭, ১৭০
ইমানিয়াত, ৩২, ৩৩
ইমামতি, ১০৫, ১৫৭
ইলহাম, ২০, ২৭, ৬৭
ইলাহ, ২৭, ৭১, ৭২, ১০৩
ইসলাম, ১, ৩, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২৭, ২৯, ৮৫, ১১১, ১১৮, ১১৯, ১২৯
ইহসান, ৩১, ৬৯, ১৪৩

ঈ

ঈদুল ফিতর, ১০৫, ১৯২
ঈসা, ৭২

উ

উমরা, ১১৫, ১২০, ১২৩, ১২৫, ১২৭, ১২৯

ও

ওজু, ৯৭, ৯৮
ওয়াজিব, ৬৯
ওয়ারিস, ১৬৫, ১৬৬
ওসিয়ত, ১৪৬, ১৬১, ১৬৩, ১৬৫

ক

কসম, ২৪, ৯৩, ১৬৩, ১৬৪, ১৮৭, ১৯৩, ১৯৪
কাবা, ১১৭
কিয়ামত, ১২, ২৫, ২৭, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৪, ১১৬, ১৬৯
কিসাস, ৭৯, ১৮৪
কুফর, ৬৪
কুরআন, ১৪, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯১, ৯৫, ৯৬, ১০২, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৯, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৩, ১৫০, ১৫১, ১৫৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৭, ১৭৯, ১৮২
কুরবানি, ৩৭, ৭২, ৭৩, ৯৪, ১১৭, ১১৯, ১২১, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০

খ

খুতবা, ১০৫, ১০৬, ১১৬, ১২৪, ১৫৭
খোদা, ৪৩, ১৮৯
খোদাতায়ালা, ১২, ১৪, ৫৬, ১৫১, ১৭৪

জ

জান্নাত, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৮৯, ১৭৪
জিনাকারী, ১৮৫, ১৮৬
জিহাদ, ৪৫, ৮০, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮

ত

তাওয়াফ, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৫
তাওরাত, ৪৯, ৫৫
তাকবির, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১২৪, ১২৯, ১৩০
তালবিয়া, ১১৭, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪
তালাক, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫
তাসবিহ, ২২, ৪০, ৭২, ৭৩, ৯৫, ১০০
তাহমিদ, ২২, ৭২, ৭৩, ৯৫, ১০০, ১২৪

দ

দোজখ, ৬৪, ৬৫

ন

নামাজ, ১৩, ২৭, ৯০, ৯১, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১২, ১১৩, ১১৬, ১২৪, ১৩০, ১৫৬, ১৫৭
নিয়াজ, ২২, ৭২, ৭৩, ১০৭

প

পবিত্র, ৩০, ৩৯, ৪০, ৬৪, ১০৮, ১২২, ১২৬, ১৩৩, ১৩৫, ১৪১, ১৪৫, ১৮৮, ১৮৯
পিতামাতা, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ১৫০, ১৫১

ফ

ফাওয়াহিশ, ৬৯
ফাসাদ ফিল আরদ, ১৮২, ১৮৩
ফিতরাত, ১৪, ২০, ৩৫, ৫৭, ৭৮, ৯৫, ১৩১, ১৫৫, ১৮৮
ফেরেশতা, ৪৭, ৬৩

ব

বারযাখ, ৬৪
বিবাহ, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৫২, ১৮৬

ম

মুনকার, ২৮, ৬৯, ৭০
মুহাম্মদ, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ২০, ২১, ২৬, ২৭, ৪৯, ৫১, ৫৫, ১০৩
মোনাজাত, ২২, ৭২, ৭৩, ৯৫, ১০০, ১১৬, ১১৮, ১২৪

য

যাকাত, ২৭, ৮৯, ৯৪, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১৫৬, ১৫৭, ১৬০

র

রুকু, ২২, ৭২, ৭৩, ৯৫, ৯৮, ৯৯

রোজা, ১৩, ২৭, ৯০, ৯১, ৯৪, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১২৬, ১২৭, ১৩৯, ১৮৫, ১৯৪

শ

শরিয়ত, ২৩, ২৮, ৪৪, ৫৫
শাস্তি, ২৫, ৪৬, ৫৯, ৭৬, ৮৩, ৯২, ১১৪, ১৩৬, ১৩৯, ১৬৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭
শিরক, ৬৪, ৭১, ১৯০

স

সুন্নাত, ১৩, ১৪, ২১, ৪২, ৪৩, ৪৫, ১০২, ১০৪, ১০৮
সেজদা, ২২, ৭২, ৭৩, ৯৫, ৯৯, ১০৪

হ

হজ্জ, ১৩, ২৭, ৯৪, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৭, ১২৯
হাকিকত, ২২, ২৮, ৩৩, ৩৫, ৫১, ৬৩, ৯৪, ১১৯, ১২৮, ১৮০
হালাল, ১৮৯, ১৯৪
হাশরের ময়দান, ৬৪
হেদায়েত, ১২, ২০, ২৩, ২৫, ৪৩, ৪৮, ৫৪, ৬৮, ৮৫, ৯৭, ১১৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৬০, ১৭৩

www.ghamidi.org

বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা

ইমদাদ হোসেন